মানুষ ও ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান

শ্রীপার্থসারথি ভট্টাচার্য

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা * * * ১৯৮১

মা ও জন্ম-মা কে

ভূমিকা

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান নিয়ে মাতামাতি বেশী দিনের ব্যাপার না হলেও গুরুত্ব ও প্রয়োজনের তাগিদে এই বিজ্ঞান আজকের জীবনে ইতিমধ্যেই অনেকটা জায়গা অধিকার করে নিয়েছে। কিন্তু এই বিজ্ঞান কি ও কেন—এই ব্যাপারে দেশের আপামর জনসাধারণের কোনও ধারণা নেই এবং এই ধারণা গড়ে তোলারও তেমন কোন প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় না। বস্তুতঃ চার/পাঁচ অংকের মাইনে এবং তদুপরি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার একটা গোলকধাম মার্কা ধারণা 'ম্যানেজমেণ্ট' নাম শুনলেই আমাদের বেশীর ভাগ লোকের মনে উদিত হয়। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের প্রতিষ্ঠানগুলির ধন ও মানের কৌলিন্য এবং এই বিজ্ঞানের রূপরেখা সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে ভাব জিইয়ে রাখার প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ প্রচেষ্টা—এগুলোই প্রধানতঃ সাধারণ জনমানসে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান সম্বন্ধে উপরোক্ত ধারণা জন্মাবার জন্য দায়ী।

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করতে হলে এবং দেশের সার্বিক শাসনব্যবস্থা ও যাবতীয় প্রতিষ্ঠান সমূহের বনিয়াদ সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে হলে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোর সার্থক ও যথাযথ প্রয়োগ করতে হবে। কি শিল্প, কি ব্যবসায়, কি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যথা স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল সর্বত্র, আজ পরিচালন ব্যবস্থার বিপর্যয় এবং চরম নৈরাজ্য চোখে পড়ে। এই অব্যবস্থা এবং নৈরাজ্য দূর করতে হলে ম্যানেজ-মেণ্ট বিজ্ঞানের মূলনীতিগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্রুত ও সার্বিক করতে হবে। এই ব্যবহারিক প্রয়োগ সার্বিক তখনি হবে যখন দেশের সাধারণ জনগণ জানবে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান কি ও কেন, জানবে এর মূলনীতিগুলো কি কি এবং সর্বোপরি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞান কার স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে কার স্বার্থ রক্ষা করে তা বুঝতে পারবে। বস্তুতঃ সাধারণ শ্রমজীবী জনগণের কাছে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান মালিক/পরিচালকের শোষণ/শাসনের হাতিয়ার ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অথচ কি ধনতান্ত্রিক, কি সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকার ব্যবস্থায়ই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান একান্ত প্রয়োজনীয় বলে পরিগণিত এবং এর মূলনীতিগুলোও অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়।

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা সাধারণ জনগণের মধ্যে জন্মাক এই উদ্দেশ্য নিয়েই আলোচ্য পুস্তকটি লিখিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় এই বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন অন্ততঃ আলোচনা শুরু হোক এটিও এই পুস্তক লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই বইটি পড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে যদি ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান সম্বন্ধে কিছুটা অনুসন্ধিৎসা জাগরিত হয় এবং কিছু ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানী বাংলা ভাষায় এই বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ ও বিস্তৃততর আলোচনায় অগ্রসর হন তাহলে এই পুস্তক রচনার উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

এখন এই পুস্তকের বিষয় এবং ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলি। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের পরিধি বিশাল এবং নিত্য নতুন এই বিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়ের সীমা বিস্তৃততর ও সমৃদ্ধ করে চলেছে। কাজেই ক্ষুদ্র পরিসরে কিভাবে এর শুরু আর কিভাবে শেষ করা হবে তা ঠিক করতেই হিম্‌সিম খেতে হয়। মানুষই যেহেতু উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাণ সেজন্য মানুষকে মূলকেন্দ্রে রেখে উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে এবং বাড়াতে মানুষী শ্রমের নিয়োগ ও তার ভূমিকা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। অনেক বিষয় এবং মূলনীতি বাদ পড়েছে, অনেক বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে এবং অনেক বিষয়ের শুধু নামোল্লেখ মাত্র করা হয়েছে। তবুও আশা এই যে এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটু পরিচয় আলোচ্য পুস্তক দিতে পারবে।

ভাষা সম্বন্ধে কোনো কট্টর মনোভাব আমাদের নেই। যে ইংরেজী শব্দগুলো বাংলায় চলে, সেগুলো রাখা হয়েছে, যে ইংরেজী শব্দগুলোর প্রতিশব্দ তেমন চালু নয়, সেগুলোর জন্য আমরা ইংরেজী শব্দগুলোই ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। আসল কথা হচ্ছে বুঝতে পারা। সাধারণ লোক যাতে পড়ে বুঝতে পারে সেজন্য সাধারণভাবে কথ্য এবং প্রচলিত শব্দ ও ভাষা ব্যবহারেরই চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষাকে সরলতর করতে গিয়ে অনেক জায়গায় হয়তো বিষয়ের গাম্ভীর্য ও কৌলিন্য অনেকটা কমেছে কিন্তু তবুও সবাই বুঝতে পারুক এই উদ্দেশ্য নিয়ে ভাষাকে যথাসম্ভব সরল ও সহজ রাখার চেষ্টা করেছি। ফলতঃ সাধারণ পাঠক যদি বইটি পড়ে বুঝতে পারেন তাহলে আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

পরিশেষে যাঁরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমার

উৎসাহ জাগিয়েছিলেন, বিশেষতঃ টাটা-প্রতিষ্ঠানের ডাঃ মেনেইজেস্, ভারতীয় অডিট ও অ্যাকাউণ্টস সার্ভিসের শ্রী এ. কে. মিত্র এবং ভারতীয় পুলিশ সার্ভিসের শ্রী এ. আলী, তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। এই পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যাপারে বন্ধুবর শ্রীব্রতীশ চট্টোপাধ্যায় এবং সদ্য ও অকালে প্রয়াতঃ শ্রীপরিমল কুমার বসু (ডি. আই. জি. ট্রেনিং) মহাশয়ের অনুপ্রেরণা আমি কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করছি। প্রকাশক 'ফার্মা-এল্. এম্. প্রাইভেট লিমিটেড'-এর কে. এল্. এম্. মহাশয়ের উৎসাহ ও প্রেরণা ব্যতীত এই পুস্তক হয়তো কখনো ছাপাখানার মুখ দেখত না। তাঁর প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি শ্রীমতী সুমনা ভট্টাচার্যের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা অপরিসীম, কেননা তাঁর সহিষ্ণুতা, সহায়তা, আনুকূল্য এবং উদ্দীপনা ব্যতীত এই বইটি আমি কথনও সম্পূর্ণ করতে পারতাম না।

আগষ্ট, ১৯৮১ শ্রীপার্থসারথি ভট্টাচার্য

কলকাতা

সূচীপত্র

॥ ১ ॥

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান ও ম্যানেজার

বর্তমান জগতে মানুষের জীবন প্রতিষ্ঠানসমূহের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হচ্ছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিটি পদে কোন না কোন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমানুষের প্রত্যেকটি কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করছে। হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, অফিস-কাছারী, ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত, ট্রেড্‌ ইউনিয়ন, মালিক সমিতি, ধর্ম সংগঠন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ সার্বিকভাবে প্রত্যেক মানুষের জীবন যাপনের পদ্ধতি ও প্রকার-প্রকরণ নির্ধারিত করে দিচ্ছে। বস্তুতঃ কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করুক আর নাই করুক, প্রতিষ্ঠানের আওতার বাইরে বাঁচার এবং সভ্য জীবন যাপন করার কোন অবকাশ নেই এবং সেজন্য সভ্যতার প্রগতি এবং প্রতিষ্ঠান সমূহের সর্বাঙ্গীন ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতিকে যদি সমানুপাতিক বলে অভিহিত করা হয় তাহলে বোধহয় খুব একটা ভুল বলা হবে না।

এই প্রতিষ্ঠানসর্বস্ব সভ্যতায় প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন না কোন ভাবে একাধিক প্রতিষ্ঠানের সংগে সংযুক্ত ও কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। যারা চাকুরীর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন শুধু তারাই নয়, স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ যারা ব্যবসা বা কৃষিকর্ম বা পেশাগত দক্ষতার প্রয়োগে জীবিকা অর্জন করেন প্রত্যেকেই কোন না কোন প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা কোনো প্রতিষ্ঠানে ঢোকেন, আর দ্বিতীয়োক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন। এই প্রতিষ্ঠান তৈরী ব্যাপারটা শুধু টাটা-বিড়লার মত বৃহৎ প্রাতিষ্ঠানিক বিস্তারের উপর নির্ভর করে না, গজেন মুদীর ছোট মুদি-খানা বা ঘনশ্যামের পানের দোকানও প্রতিষ্ঠান অভিধার অন্তর্ভুক্ত। হাস-পাতাল, স্কুল-কলেজ, রামকৃষ্ণ মিশন, মোহনবাগান ক্লাব থেকে শুরু করে মোড়ের মাথায় টিম্‌টিমে পানের দোকান সব কিছুকেই আমরা প্রতিষ্ঠান বলছি। আবার টাটা-বিড়লার সংস্থাগুলো যেমন প্রতিষ্ঠান ঠিক তেমনি 'থালা বাসন চাই' বলে যে ফেরীওলা হাঁক দিয়ে যায় তার ব্যবসাকেও আমরা প্রতিষ্ঠান বলছি। তাহলে প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা কিভাবে দেওয়া যায় তা এখন দেখা উচিত। যে কোন প্রতিষ্ঠানই মানুষের জন্য, মানুষকে নিয়ে মানুষের

দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু শুধু মানুষই নয়—যে কোন প্রতিষ্ঠানই হচ্ছে মানুষ ও সম্পদের সমন্বয় অর্থাৎ শ্রম এবং মূলধনের সমাহার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন উদ্দেশ্য থাকতে পারে। কিন্তু উদ্দেশ্যের যতই ভিন্নতা থাকুক না কেন —এক জায়গায় তারা সবাই এক। নিয়োজিত সম্পদ ও মূলধন থেকে সর্বাধিক পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া এবং নিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করা যে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। যে কোন প্রতিষ্ঠানই সংগঠন সাপেক্ষ—সংগঠন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার এবং ব্যক্তি ও সম্পদের একত্র সমাহার ও সন্নিবেশে সংগঠন তার উদ্দেশ্য রূপায়িত করতে চায়।

জগতের তাবৎ প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রধানতঃ দুভাবে ভাগ করা যায়—ব্যবসায়গত এবং অন্যান্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে লাভ বা মুনাফা আর দ্বিতীয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য হচ্ছে সার্ভিস বা সেবা। হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি এই দ্বিতীয় প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই বিভাগ সর্বত্র ও সর্বথা প্রযোজ্য নয়, বর্তমানে বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলো শুধুমাত্র মুনাফা অর্জনই তাদের প্রধান ও একমাত্র উদ্দেশ্য বলে স্বীকার করে না—সেবাও তাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। এমন কি ১৯২১ সালেই ধনতন্ত্রের পীঠস্থান খোদ আমেরিকায় **I. T. T.**-র মত প্রতিষ্ঠান [অন্যতম বৃহত্তম ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান] তাদের প্রধান উদ্দেশ্য সেবা বলে অভিহিত করেছে। এটা যে শুধু কথার কথা তা ভাবা ঠিক হবে না। আজ কোন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠানই মুনাফা ও সেবার যৌথ উদ্দেশ্য ছাড়া টিকে থাকতে পারবে না। আবার অন্যদিকে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গুলোও সেবা উৎসৃজন ছাড়াও কিছু লাভ চাইছে—নিদেনপক্ষে আর্থিক স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করছে।

অতএব বলা যেতে পারে যে উদ্দেশ্য বা উদ্দেশ্যসমূহের সর্বোত্তম পূর্তি-সাধন করাই যে কোন প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এই ব্যাপারে যে শাস্ত্র আলোচনা করে অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট সর্ববিধ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান আলোচনা করে সেই শাস্ত্রকেই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান বলা হয়। আরেকটু বিশদ্‌ভাবে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে : কোন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত শ্রম ও সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সেই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সর্বোত্তমভাবে

সাধন করার পক্ষে প্রয়োজনীয় জ্ঞান যে শাস্ত্রে পাওয়া যায় তাকে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান বলে। ব্যক্তি ও বস্তুর সমন্বয়ে যে উৎপাদন ব্যবস্থা বা উৎপাদন কাঠামো গড়ে ওঠে তার সুচারু ও যৌক্তিক বিন্যাসের মধ্যেই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। উৎপাদনশীলতা বা productivity যে কোন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রাণ বিশেষ। উৎপাদনশীলতার সর্বোত্তম সাধনই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের আদর্শ। অতএব ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান উৎপাদন পদ্ধতিকে কিভাবে আরো উৎপাদনশীল করে তোলা যায় সেই উপায়সমূহ নির্ধারিত করে দেয়।

উৎপাদনশীলতা বা productivity বলতে সবচেয়ে সহজভাবে যা বোঝান যায় তা হচ্ছে এই যে সবচেয়ে কম খরচে সবচেয়ে বেশী উৎপাদন পাওয়ার নামই উৎপাদনশীলতা। যে কোন বস্তু উৎপাদন করতে গেলে কিছু উপাদান বা input প্রয়োজন। জমি, মূলধন ও শ্রম এই তিনভাগে উপাদানসমূহকে ভাগ করা যায়। কারখানা, কাঁচামাল, মেশিনপত্র, কায়িকশ্রম ইত্যাদি যাবতীয় উপাদানই উপরোক্ত প্রধান তিনটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এই উপাদান সমূহের ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপন্ন সামগ্রী বা output সবচেয়ে বেশী করে পাওয়ার নামই উৎপাদনশীলতা। অর্থ বা টাকাকড়িই যেহেতু উপাদানসমূহের পরিমাপের মাপকাঠি, সেহেতু কম অর্থ ব্যয় করে অনেক বেশী সামগ্রী—যার পরিমাপের এককও অর্থ—উৎপাদন করা, আর কম ব্যয়ে বেশী আয় করা বলা বোধহয় প্রায় একই কথা। উৎপাদনশীলতা প্রধানতঃ দুভাবে সাধিত হতে পারে। মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রম এবং বুদ্ধি, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, সময় ইত্যাদি উৎপাদনের উৎপাদনসমূহের উপযোগ বা efficiency বাড়ানো যেতে পারে অথবা উক্ত উপাদানসমূহের অপচয় বা wastefulness কমানো যেতে পারে। যাই করা হোক না কেন এর ফলাফল, উক্ত উপাদান-সমূহের ব্যবহারে যে output বা উৎপন্ন সামগ্রী তৈরী হয় তার ওপর পড়বে এবং যেহেতু উপাদানসমূহের উপযোগ বাড়ছে ও অপচয় কমছে সেজন্য উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণও বেড়ে যাবে। অতএব, উপাদানসমূহের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সর্বোত্তম উৎপাদন লাভ করাই হচ্ছে উৎপাদনশীলতার সারকথা।

প্রতিষ্ঠান প্রসংগে আমরা দেখেছি যে প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রধানতঃ দুটো উদ্দেশ্য নিয়েই সংগঠিত হয়—ব্যবসায়মূলক ও সেবামূলক। এখন আমরা যে উৎপাদন-

শীলতার কথা বললাম তা ব্যবসায়মূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই খাটে। তাহলে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কি উৎপাদনশীলতার কোন ভূমিকা নেই? সেবামূলক প্রতিষ্ঠানও অর্থব্যয় করে, শ্রম বিনিয়োগ করে, সময়, বুদ্ধি, ঘরবাড়ী ইত্যাদি উপাদানসমূহ প্রয়োগ করে—অর্থাৎ উৎপাদনের সকল উপাদানই কাজে লাগায়। ব্যবসায়মূলক প্রতিষ্ঠানের সংগে সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য শুধু উদ্দেশ্যের—প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ বাড়াতে চায় আর দ্বিতীয়োক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে সেবা উৎপন্ন করে। অতএব, সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য হচ্ছে—কত কম খরচে কত বেশী সেবা করা যায় বা উৎপাদনসমূহের কত কম আনুপাতিক প্রয়োগে সেবার পরিমাণ কতটা বাড়ান যায়। হাসপাতাল সেবামূলক প্রতিষ্ঠান—এর উদ্দেশ্য নানাধরণের হতে পারে। প্রথমতঃ, সেবার standard বা মান বজায় রেখে সবচেয়ে কম অর্থ ব্যয় করে সবচেয়ে বেশীসংখ্যক রোগীর সেবা করা এর উদ্দেশ্য হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক রোগীর সেবা কত কম খরচে করা যায় তা এর উদ্দেশ্য হতে পারে। তৃতীয়তঃ, একটা নির্দিষ্ট খরচের মধ্যে সবচেয়ে কত বেশী রোগীর ন্যূনতম সেবা করা যায় তাই এর উদ্দেশ্য হতে পারে। শিক্ষা বা সমাজসেবা মূলক তাবৎ প্রতিষ্ঠানসমূহের উদ্দেশ্য এইভাবে দেখানো যেতে পারে। উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, উপাদানসমূহের উপযোগ বাড়ান বা অপচয় কমান ব্যতিরেকে অন্য কোন পন্থায়ই কোন উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে না। অর্থাৎ উৎপাদনশীলতার সাধন ব্যতিরেকে উদ্দেশ্যের সর্বোত্তম পূর্তিসাধন অসম্ভব ব্যাপার। অতএব, কি সেবামূলক কি ব্যবসায়-মূলক উভয়ক্ষেত্রেই উৎপাদনশীলতা সমগুরুত্বপূর্ণ। সেবামূলক প্রতিষ্ঠানেও উপাদানসমূহের উপযোগ বাড়ান এবং অপচয় কমানোর সমান সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে—শুধু এখানে উৎপন্ন সামগ্রী যেহেতু দ্রব্যের পরিবর্তে সেবা সেজন্য সবসময় এর আর্থিক মূল্যায়ণ চলে না—সামাজিক মূল্যায়ণও করতে হয়।

উৎপাদনশীলতাই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। বিভিন্ন উপাদানের উপযোগ কিভাবে বাড়ানো যেতে পারে, বিভিন্ন উপাদানের ব্যবহারে কিভাবে অপচয় হয় এবং কিভাবে তা কমানো যায়, ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান শুধু যে তা নির্ণয় করে তাই নয় উপাদান ব্যবহারের সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত

ও ফলপ্রদ উপায়ও জানিয়ে দেয়। উৎপাদন পদ্ধতি কিরকম হওয়া উচিত, উৎপাদন কাঠামো কিরকম হওয়া উচিত, সংগঠনের প্রকার-প্রকরণ এবং পদ্ধতি কি ধরনের হওয়া উচিত—ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান শুধু যে তা আলোচনা করে তাই নয় সর্বাপেক্ষা যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞান সম্মত পন্থা-পদ্ধতিও স্থির করতে সাহায্য করে। কিন্তু সমস্ত আলোচনারই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে উৎপাদনশীলতার সর্বাধিক্য সাধন। অতএব কি করে কি পদ্ধতিতে কোন উৎপাদন কাঠামোকে সর্বাধিক উৎপাদনশীল করা যায় ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান তারই পথ নির্দেশ করে।

মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রম ব্যতীত উৎপাদনকার্য অসম্ভব। শুধুমাত্র কাঁচামাল, মেশিনপত্র বা ফ্যাক্টরী থাকলেই উৎপাদন হবে না। মানুষী শ্রম বস্তুতে প্রযুক্ত হয়েই নতুন বস্তু বা সেবা উৎপন্ন করে। এমন কি পরিপূর্ণ স্বয়ংক্রিয় বা **automatic** উৎপাদন পদ্ধতিতেও মানুষী শ্রম অপরিহার্য। মানুষী শ্রম—সে কায়িক বা মানসিক যাই হোক না কেন—যন্ত্র, কাঁচামাল ইত্যাদিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে প্রযুক্ত হয় এবং এর ফলে যে ফললাভ হয় তাই হচ্ছে উৎপাদন। অতএব শ্রম, বস্তু এবং পদ্ধতি এই তিনটিই হচ্ছে যে কোন উৎপাদন কাঠামোর প্রধান অঙ্গ। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান এই তিনটি বিষয়েরই আলোচনা করে। মানবিক সম্পদ, অ-মানবিক সম্পদ এবং উৎপাদন পদ্ধতি—এই তিনের বিজ্ঞান-সম্মত ও সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত প্রযুক্তিতেই উৎপাদনশীলতার সর্বাধিক বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং সেজন্য ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের আলোচনা ও গবেষণা এই তিন ক্ষেত্র ধরেই এগোয়।

যে কোন প্রতিষ্ঠান যেহেতু মানুষের জন্য, মানুষকে নিয়ে, মানুষের দ্বারা সংগঠিত সেহেতু মানুষই প্রতিষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ। প্রতিষ্ঠান একটি মানবিক সত্ত্বা, এবং মানুষী শ্রমের সাহায্যেই প্রতিষ্ঠান তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ করে। মানুষ ছাড়া কোন উৎপাদনকার্য হতে পারে না এবং উৎপাদনশীলতার কোন অর্থ থাকে না। মানুষই নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার সাহায্যে কিছু কাঁচামাল বা উপাদানের ব্যবহার ক'রে কিছু দ্রব্য সামগ্রী উৎপন্ন করে। মানুষ ছাড়া উৎপাদনের কোন অর্থ নেই এবং উৎপাদনশীলতারও কোন মানব-অতিরিক্ত ধারণা থাকতে পারে না। যন্ত্রপাতি বা কাঁচামালের উপযোগ বাড়িয়ে বা/এবং অপচয় কমিয়ে উৎপন্ন সামগ্রীর যে হার বাড়ে সেটার জনয়িতা কিন্তু আসলে

মানুষীশ্রম। যন্ত্রের বা কাঁচামালের সর্বোত্তম ব্যবহারের পেছনে মানুষের বুদ্ধিই কাজ করে। ফলতঃ যন্ত্রের বা কাঁচামালের নিজস্ব স্ব-নির্ভর কোন উৎপাদনশীলতা থাকতে পারে না। অতএব মানুষের কায়িক ও মানসিক উভয়প্রকার শ্রম অর্থাৎ মানুষীশ্রমের সর্বোত্তম বিনিয়োগই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রধান আদর্শ। অন্যান্য যাবতীয় অ-মানবিক সম্পদ বা উপাদানের সর্বোত্তম উপযোগের মাধ্যমে মানুষী শ্রমেরই সর্বোত্তম বিনিয়োগ সাধিত হয়। অতএব দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধারা-প্রধারা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান যা কিছু আলোচনা করুক না কেন এর মূলকেন্দ্রে মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নেই। মানুষ অর্থাৎ মানুষী শ্রমই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। মানুষের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ কিভাবে আদায় করা যায়, মানুষী শ্রমের সর্বোত্তম বিনিয়োগ কিভাবে করা যায়, মানুষী শ্রমের অপচয় কিভাবে কমানো যায়, অর্থ সময় যন্ত্রপাতি কাঁচামাল এবং উৎপাদন পদ্ধতি ও পরিবেশের বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে কিভাবে মানুষের উৎপাদনশীলতা বাড়ান যায়, ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান এই আলোচনাই করে। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলনীতি বা principles এবং techniques আসলে এই মানবিক মূলকেন্দ্রকেই বিবর্ধিত করতে সচেষ্ট।

ফলতঃ অর্থাৎ মানুষ যেহেতু মূলকেন্দ্রে রয়েছে সেজন্য সমাজতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, শারীরবিদ্যা, এঞ্জিনীয়রীং ইত্যাদি তাবৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের অংশবিশেষ নিয়ে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানকে আলোচনা করতে হয়। এর সংগে অঙ্ক, রাশিবিজ্ঞান, ফিজিক্স ইত্যাদিও হাত মেলায়। বস্তুতঃ ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান বহুবিধ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের একত্র সন্নিবেশে নিজস্ব একটা জ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠেছে। কাজকর্ম করতে করতে বিশেষতঃ শিল্প-বিপ্লব-পরবর্তী কাল থেকে বৃহদায়তন শিল্পগুলোর বিবর্তনের সংগে সংগে কাজকর্মের প্রকার-প্রকরণ অনুশীলন করতে করতে, কিছু কিছু কাজকর্মের নিয়ম-কানুন লক্ষ্য করা গেল। এই নিয়ম-কানুনগুলো বিশ্লেষণ করে প্রাপ্ত ফলাফল নতুন কাজকর্মে প্রয়োগ করা হল। এইভাবে নতুন নতুন অভিজ্ঞতার জন্ম হল এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে কাজকর্ম সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ক্রমশঃ বিবর্তিত হতে থাকল। বস্তুতঃ ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের উৎপত্তি বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের পর্যালোচনার মাধ্যমেই হয়েছে। বিভিন্ন কাজকর্মের পর্যালোচনায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করা

গেল তার সংগে কর্মে অনুসৃত নীতি ও ধারণাসমূহের একত্র যুক্তিনিষ্ঠ সন্নিবেশে এই বিজ্ঞান জন্মলাভ করেছে এবং এখনও এভাবেই এই বিজ্ঞান পুষ্টিলাভ করে চলেছে। এই বিজ্ঞানের উদ্ভব ব্যবহারিক কাজকর্মের জগৎ থেকে—অর্থাৎ কর্ম করতে করতেই এর ধারণা সমূহের উৎপত্তি হয়েছে, তাত্ত্বিক জ্ঞান এসেছে পরে। সংশ্লিষ্ট বহুবিধ অন্যান্য জ্ঞান বিজ্ঞানের তত্বাদি যা কিনা কাল-ক্রমে অর্জিত হয়েছে এবং হচ্ছে তাও এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। এইভাবে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান এখনও উত্তরোত্তর বিবর্ধিত হচ্ছে এবং ম্যানেজমেণ্ট সম্বন্ধে এতাবৎকাল ধরে অর্জিত ও প্রকাশিত পুরানো ধারণাসমূহ নস্যাৎ করে প্রায় রোজই নতুন নতুন ধারণাসমূহের উৎপত্তি হচ্ছে। ফলতঃ এই বিজ্ঞানের পরিধি ক্রমপ্রসরমান এবং একটা সার্বিক তত্ত্বদর্শী অ্যাপ্রোচ বা multi-disciplinary approach ব্যতিরেকে এই বিজ্ঞানের অনুশীলন অসম্ভব।

"ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের" আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে একটা ধারণা না হয় করা গেল। কিন্তু "ম্যানেজার" সম্পর্কে কোন কথাই আমবা বলিনি। তাই এখন যে সংগত প্রশ্নটা বিবেচনা করতে হয় তা হচ্ছে "ম্যানেজার" কে, কী তার কাজকর্ম, কী তার প্রয়োজন, কী ভাবে সে কাজ করে ইত্যাদি।

বস্তুতঃ বর্তমানে আমরা এত অধিক সংখ্যায় বিভাগীয় বিভিন্ন ম্যানেজারের কথা শুনছি যে মাঝে মাঝে আসল ম্যানেজারটি কে এ কথাটাই বোঝা যায় না। যেমন—

ফিন্যান্স/এ্যাকাউণ্টস্ ম্যানেজার
প্রোডাকশন ম্যানেজার
ওয়ার্কস/প্ল্যাণ্ট ম্যানেজার
পার্সোনেল ম্যানেজার
পার্চেজ/কমার্শিয়াল ম্যানেজার
টেক্‌নিক্যাল ম্যানেজার
ডেভেলাপমেণ্ট/প্ল্যানিং ম্যানেজার
সেল্‌স্/মার্কেটিং ম্যানেজার
ষ্টোর্স/মেটেরিয়াল ম্যানেজার
পাবলিসিটি/বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার ইত্যাদি

—এর ওপরে আবার রয়েছে জেনারেল ম্যানেজার। এবংবিধ বাহুল্যের মধ্য থেকে আসল ম্যানেজারটিকে খুঁজে পাওয়া কি সহজসাধ্য, নাকি এরা সকলেই ম্যানেজার? এসব প্রশ্নের উত্তর বুঝতে হলে আসলে ম্যানেজার কথাটার অর্থ বুঝতে হয়। কোনো ব্যক্তি যদি অধীনস্থ এক বা একাধিক ব্যক্তির কার্যাবলীর দায়িত্ববহন করে, তবে সেই ব্যক্তি যে নামেই পরিচিত হোক না কেন, আসলে সে একজন ম্যানেজার। ম্যানেজার হচ্ছে একজন দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তি যে নিদেনপক্ষে অন্ততঃ একজন অধীনস্থ কর্মচারীকে চালিত করে এবং তার কৃতকর্মসমূহের জন্য দায়িত্বভাগী হয়। ফলতঃ এ সংজ্ঞার ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ম্যানেজার নামে অভিহিত না হলেও জগতে অনেক লোকই আসলে ম্যানেজার। অতএব পরবর্তী প্রশ্ন ওঠে ম্যানেজারের কাজ কী? এক কথায় বলতে গেলে ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য অধীনস্থ ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের কর্মধারার এমন সুসংগঠন এবং সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালন যাতে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সর্বোত্তমভাবে সাধিত হতে পারে। ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে অধীনস্থ লোকজনকে চালিত করা এবং এ চালনা শুধু যে—প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসাধনের লক্ষ্য নিয়েই এগুবে তাই নয়, যারা চালিত হচ্ছে তারা যেহেতু মানুষ, সেই মানুষগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছা ইত্যাদি মনোবৃত্তির কথাও ম্যানেজরেকে ভাবতে হয়। কেননা, মানুষের মন, প্রবৃত্তি আর দৃষ্টিভঙ্গীই তার সকল কাজকর্মের নিয়ামক এবং সে জন্যই যে লোককে দিয়ে কাজ করাতে হবে এবং যার কাছ থেকে সর্বোত্তমভাবে কাজ আদায় করতে হবে তার মন শুধু যে প্রয়োজনীয় বিচার্য বিষয় তা নয়, সম্ভবতঃ সর্বপ্রধান বিবেচ্য বিষয়। অতএব ম্যানেজার হচ্ছে ব্যক্তি আর প্রতিষ্ঠানের সংযোজক, ব্যক্তিক উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামূহিক উদ্দেশ্যের স্বচ্ছন্দ সুচারু সন্নিবেশের সংগঠক ও নিয়ন্ত্রক।

বিভাগীয় ম্যানেজার, যাদের কথা ওপরে বলা হয়েছে তারা সকলেই ম্যানেজার এবং 'ম্যানেজার' নামে অভিহিত নন অথচ ম্যানেজারোচিত কাজ-কর্ম করেন, যে কোন প্রতিষ্ঠানে এ ধরণের ব্যক্তি অনেকেই রয়েছেন। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সংগে সংগতি রেখে যে কোন কর্মধারা বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি এ সমস্ত বিভাগের কর্মধারার নিয়ামক হন, তাই তাদের সেই বিভাগীয় কর্মকর্তারূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ধরা

যাক—সেলস্ ম্যানেজারের কথা। মনে করা যাক কোন একটি কোম্পানী কোন এক ধরনের দ্রব্য উৎপন্ন করে এবং নিজেই সেই দ্রব্যের বিপনন করে। সেলস্ ম্যানেজারের দায়িত্ব ধরা যাক বর্তমান বছরে দশ হাজার সেই দ্রব্যের বিক্রয় নিশ্চিত করা এবং আগামী বছরে সেই দ্রব্যের বিক্রয় আরো এক হাজার বাড়ানো। সেলস্ ম্যানেজারের অধীনে কিছু ব্যক্তি ও সম্পদ নিযুক্ত আছে। এখন উক্ত ম্যানেজারের আসল কাজ হচ্ছে অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের কাজকর্ম এমনভাবে নির্ধারিত করা যাতে ঐ ব্যক্তিবর্গ উপরোক্ত উদ্দেশ্যপূরণের জন্য নির্ধারিত পরিকল্পনায় আপন সকল সামর্থ ঢেলে দেয় এবং উদ্বুদ্ধতার সংগে সেই পরিকল্পনাকে সার্থকতার পথে নিয়ে যায়। যদিও পরিকল্পনাটা সেলস্ ম্যানেজারের, কিন্তু এর সার্থকতা অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের কাজকর্মের ওপর নির্ভরশীল। অতএব বিভাগীয় ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত বিভাগীয় লক্ষ্য সমূহের সম্পূর্ণ ও সর্বোত্তম পূর্তির জন্য অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের কাজকর্ম পরিচালনা করা। অবশ্যই কিছু সম্পদ বিভাগীয় ম্যানেজারের হাতে ন্যস্ত করা আছে—যাতে অধীনস্থ ব্যক্তি ও ন্যস্ত সম্পদের সর্বোত্তম নিয়োগের মাধ্যমে সে তার বিভাগীয় লক্ষ্যে পৌছতে পারে।

এখানে একটা কথার উল্লেখ করা উচিত। শুধুমাত্র সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা কোন ম্যানেজারের কাজ হতে পারে না। যে ব্যক্তি একটা মেশিন চালায় সে ঐ মেশিনের অপারেটর, ম্যানেজার নয়। যে মোটরগাড়ী চালায় সে ড্রাইভার—কিন্তু যে ব্যক্তি জাহাজ চালায়, জাম্বো জেট্ চালায় বা একটা সামরিক ট্যাঙ্ক চালায় সে একজন ম্যানেজার কেননা সে তার অধীনস্থ কিছু লোকজনের কাজকর্মের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিচালনার মাধ্যমেই তার দায়িত্ব পালন করে। অতএব ম্যানেজার সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পক্ষে যে শর্তটি প্রধান এবং অবশ্যপূরণীয় তা হচ্ছে এই যে—ম্যানেজারের অধীনে অন্ততঃ একটি ব্যক্তি থাকবে, যার কাজকর্ম ম্যানেজারের পরিচালনাধীন হবে এবং যার কাজ-কর্মের জন্য ম্যানেজার দায়িত্বভাগীও থাকবে; শুধুমাত্র সম্পদ, সে অর্থই হোক, মেশিনপত্রই হোক অথবা বাড়ী জমি ইত্যাদি বা যে কোন উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীই হোক, একমাত্র এগুলোরই নিয়ন্ত্রণ করলে ম্যানেজার হওয়া যায় না। ছোট প্রতিষ্ঠানের ক্যাশিয়ার বা ষ্টোরকীপার যেহেতু একাই তাদের দায়িত্ব

নির্বাহ করে সেহেতু তারা ম্যানেজারের সংজ্ঞায় পড়ে না। কিন্তু বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহে যেখানে একাধিক করণিক ক্যাশিয়ারের ক্যাশ সংক্রান্ত কাজকর্মে সহায়তার জন্য নিযুক্ত থাকে, যেখানে একাধিক করণিক বা সহায়ক ষ্টোরকীপারের কাজকর্ম সুসম্পন্ন করার জন্য নিযুক্ত থাকে—সেখানে ক্যাশিয়ার বা স্টোরকীপার 'ম্যানেজার' নামযুক্ত না হয়েও 'ম্যানেজারীয় কাজকর্মই' করে থাকে।

অতএব ম্যানেজার নামধারী না হয়েও বহুলোক 'ম্যানেজারীয় কাজকর্ম' করে থাকে এবং এই জাতীয় কাজকর্ম যে কোন সংস্থায় যে কোন বিভাগেই থাকতে পারে। ম্যানেজার সম্বন্ধে সাধারণ লোকের 'কয়েক হাজার টাকা মাইনে তদুপরি বহুবিধ সুযোগ সুবিধা' ইত্যাদি সূচক যে ধারণা তা প্রতিষ্ঠান বিশেষের প্রধান কার্য নির্বাহক সম্বন্ধে খাটতে পারে, কিন্তু ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে 'ম্যানেজার' বলতে যা বোঝান হয় তার সংগে এই লৌকিক ধারণার কোন সম্পর্ক নেই। ম্যানেজার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা তখনি পরিষ্কার হবে যখন আমরা 'ম্যানেজারীয় কাজকর্ম' সম্পর্কে কিছু জ্ঞান অর্জন করব। তাই এখন 'ম্যানেজারীয় কাজকর্ম' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনায় আমরা এগিয়ে যাই।

॥ ২ ॥

ম্যানেজারীয় কাজকর্ম

ম্যানেজার যে কাজ করে তাকেই সহজ কথায় 'ম্যানেজারীয় কাজকর্ম' বলা যায়। যে কোন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনশীলতার সর্বোত্তম সাধনই হচ্ছে একমাত্র আদর্শ এবং ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে কাজকর্মের ধারা-প্রধারা তথা উপায় এমনভাবে বিন্যস্ত করা, যাতে উৎপাদন পদ্ধতি সর্বোত্তম উৎপাদনশীল হয়ে ওঠে। অতএব উৎপাদনশীলতার সর্বোত্তম সংঘটন ঘটানোর উদ্দেশ্যে ম্যানেজার যে যে কাজ করে, যেভাবে করে তাকেই 'ম্যানেজারীয় কাজকর্ম' বলে অভিহিত করা যায়।

কিছু উদ্দেশ্য নিয়েই যে কোন প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয়। এই উদ্দেশ্যসমূহকে সর্বাধিক উৎপাদনশীলতার সংগে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব ম্যানেজারের। কিছু শ্রমিক, কিছু অর্থ এবং কিছু মূলধন—এই উৎপাদনের উপাদানগুলো ম্যানেজারের নিয়ন্ত্রনাধীনে রয়েছে। এখন ম্যানেজার কিভাবে এই উপাদান-সমূহের সদুপযোগে লক্ষ্যে পৌছোয় সেটাই একমাত্র বিবেচ্য বিষয়। কিভাবে ম্যানেজার তার দায়িত্বপালন করে বা করবে এ সম্বন্ধে যে জ্ঞান ও ধ্যান ধারণা তাহাই ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। আরো বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে বললে এগুলোকে ম্যানেজারীয় কাজকর্মের আলোচ্য বিষয় বলা যায়। একটু বিশদ করে বললে এভাবে বলা যেতে পারে যে, ম্যানেজারীয় কাজকর্মের অর্থ হচ্ছে ম্যানেজার কিভাবে তার উদ্দেশ্য পালনের জন্য কাজকর্ম করে, কিভাবে চিন্তা ভাবনা করে তথা আপন অধীনস্থ সম্পদের ব্যবহার এবং অধীনস্থ ব্যক্তিবর্গের কর্মধারা পরিচালিত করে—অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য ম্যানেজার যা কিছু করে থাকে তাকেই ম্যানেজারীয় কাজকর্ম বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এখন একটু বিস্তৃতভাবে আমরা ম্যানেজারীয় কাজকর্মের আলোচনা করব।

পরিকল্পনা হচ্ছে যে কোন কাজের গোড়ার কথা। ম্যানেজারীয় কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী করেই খাটে। অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ ভেবে নিয়ে, ভালো করে পর্যালোচনা করে নিয়ে—অর্থাৎ কি কি সমস্যা উদ্ভূত হয়েছিল, কি কি সমস্যা বর্তমানে দেখা দিয়েছে এবং কি কি সমস্যা দেখা দিতে পারে একটা সুদূর-প্রসারী দৃষ্টিকোণে এগুলো বিচার করে একটা

উদ্দেশ্য বা কিছু উদ্দেশ্য নিরূপণ করা যেতে পারে। উদ্দেশ্য নিরূপণই হচ্ছে পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। উদ্দেশ্যগুলো যদি যুক্তিসম্মত ও বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হয় তাহলে এগুলোর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব নয়। সেজন্য উদ্দেশ্য-গুলোকে শুধুমাত্র চিহ্নিত করলেই চলবে না, এগুলোকে পরিমাপযোগ্য এককেও নির্ধারিত করতে হবে।

ধরা যাক দেশের সমস্ত লোককে আগামী দশবছরের মধ্যে সাক্ষর করে তোলার জন্য একটা পরিকল্পনা করতে হবে। এই লক্ষ্যটা মহৎ সন্দেহ নেই কিন্তু এর দ্বারা সমস্যাটার কিছুই পরিষ্কার হয় না। দেশে লোকসংখ্যা কত, তার মধ্যে নিরক্ষরের শতকরা ভাগ কত, আগামী প্রতিবছরে লোকসংখ্যা কি হারে বাড়বে তা স্থির করতে হবে। তারপর এই দশ বছরের মধ্যে বাৎসরিক হিসেবে কত স্কুল, কত শিক্ষক, কত বইপত্র, কত কাগজ কলম লাগবে এগুলো সংখ্যায় প্রকাশ করতে হবে। এরপরে প্রতি মাস বা বছরের হিসেবে কত স্কুল, কত শিক্ষক বা কত বইপত্র লাগবে এর একটা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করতে হবে। এবারে আমরা বলতে পারি যে প্রতি বছরে প্রতি জেলায় পঞ্চাশটি করে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে বা প্রথম বছরে একশটি, দ্বিতীয় বছরে পঞ্চাশটি, তৃতীয় বছরে চল্লিশটি এইভাবে ক্রমহ্রাসমান হারে প্রতিবছরে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপনা করে যেতে হবে। এটাই হচ্ছে উদ্দেশ্য। ধরা যাক্ জ্বালানী সমস্যায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে সরকার ঠিক করল যে দেশের অভ্যন্তরের জ্বালানীর সর্বাপেক্ষা উৎপাদন বাড়াতে হবে এবং নতুন জ্বালানীর আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু এই বৃহৎ উদ্দেশ্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত পরিমাপযোগ্য এককে পরিণত না হচ্ছে ততক্ষণ এর কোন অর্থ নেই। অতএব বাৎসরিক হিসেবে কতটা পরিমাণ কয়লা, তৈল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন বাড়ানো হবে, কি হিসেবে নতুন তৈলকূপ বা কয়লাখনি বাড়ানো হবে তা সংখ্যায় স্থির করে বলতে হবে। ঠিক তেমনি বছরে কত অর্থ পরিবর্ত জ্বালানীর, যেমন সৌর-শক্তি, উন্নতিকল্পে ব্যয় করা হবে তা স্থির করতে হবে। কি করে স্থির করা হবে? সাধ ও সাধ্যের একটা সমীকরণ ঘটিয়ে অর্থাৎ অন্যান্য বহুবিধ সমস্যার মোকাবিলা করে এ বাবদে কত অর্থ ব্যয় করা যাবে তা যেমন খতিয়ে দেখতে হবে তেমনি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ত্বরান্বিত করার জন্য অন্যান্য দিকে কতটা ত্যাগস্বীকার করা যায় তাও দেখতে হবে।

তা না হয় হল অর্থাৎ বোঝা গেল যে উদ্দেশ্যগুলোকে সংখ্যাগতভাবে লিপিবদ্ধ বা কোয়ান্টিফাই করতে হবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্য নির্ধারণ ব্যাপারটা শুধুমাত্র জাতি বা সরকারের ক্ষেত্রেই খাটে না, ক্ষুদ্র-বৃহৎ যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য। যে কোন ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যসমূহের নিধারণ ও নিরূপণ এইভাবেই করতে হবে। আরেকটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। উদ্দেশ্য নির্ধারণ ব্যাপারটা কোন স্থায়ী ও স্থাণু ব্যাপার নয়, অন্যান্য সব ব্যাপারের মতই এখানেও 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' বলে কোন কথা নেই। সেইজন্য পরিবর্তিত পরিস্থিতি, নবোদ্ভূত সমস্যা তথা যে কোন পরিস্থিতি বা সমস্যার মোকবিলা করার মত ব্যবস্থা থাকা দরকার। অর্থাৎ প্রয়োজনমত উদ্দেশ্য সমূহকে পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত তথা পরিমার্জিত করার মত নমনীয়তা বা স্থিতিস্থাপকতা যেন গোটা পদ্ধতিটার মধ্যেই built-in বা অঙ্গীভূত থাকে। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চলিষ্ণু ধারা বিশেষ; এবং এই ব্যাপারটা যদি সামগ্রিকভাবে উদ্দেশ্য নিরূপণের ক্ষেত্রে স্বীকৃত থাকে তাহলে উদ্দেশ্য সমূহ কখনো অবাস্তব বা ভিত্তিহীন হবে না।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে উদ্দেশ্য সমূহের নির্ধারণ ও নিরূপণই হচ্ছে পরিকল্পনার প্রাথমিক পর্যায়। কিন্তু এই পরিকল্পনা ব্যাপারটাই বা করা কেন— কি তার উদ্দেশ্য? নির্ধারিত উদ্দেশ্যসমূহের পরিপূর্ণ পূর্তিসাধনই হচ্ছে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য—এছাড়া পরিকল্পনা করার আর কোন অর্থ নেই। কিন্তু কিভাবে এগুলোর পূর্তিসাধন হবে? এখানেই আসছে পলিসি নির্ধারণের ভূমিকা। উদ্দেশ্য নির্ধারণ তথা নিরূপণ হয়ে গেল এবং সংখ্যার আঙ্গিকে তা লিপিবদ্ধও করা হল। কিন্তু একটা উদ্দেশ্য তো বহুভাবে অর্জন করা যেতে পারে। একটা উদ্দেশ্য সাধনের বহুবিধ বিকল্পের মধ্য থেকে সবচেয়ে ভালোটিকে বাছাই করার নামই হচ্ছে পলিসি নির্ধারণ করা। অতএব পলিসি ঠিক করাই হচ্ছে পরিকল্পনার দ্বিতীয় পর্যায়। নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহের সম্পাদন তথা অর্জন পলিসি/পলিসিসমূহই ঠিক করে দেয়—অর্থাৎ কিভাবে কাজ করলে এগুলো ঠিকমত সাধিত হয় তা ঠিক করাই পলিসির বিবেচ্য বিষয়। একটা উদ্দেশ্য সাধনের বহুবিধ বিকল্প থাকতে পারে—এর মধ্য থেকে আসলটাকে অর্থাৎ সর্বাধিক বিবেচনায় সর্বোত্তম উপায় বা পথটিকেই বেছে নিতে হবে। অতএব পলিসি ঠিক করা আর নির্দিষ্ট কোন ডিসিশন বা সিদ্ধান্তে উপনীত

হওয়া প্রায় একই কথা। এখানেই হচ্ছে আসল গেরো। অনেকগুলো বিকল্প উপায়ের বা পথের মধ্য থেকে কোনটা যে সবচেয়ে ভালো হবে অর্থাৎ কোন পলিসিটা গ্রহণ করলে উদ্দেশ্য সাধন সর্বোত্তম হবে এটা ঠিক করা সহজ ব্যাপার নয়। এখানেই আসছে ম্যানেজারের ভূমিকা—কেননা ডিসিশন নেওয়া ম্যানেজারেরই কাজ এবং যার ডিসিশন যত পাকা তিনিই তত দক্ষ ম্যানেজার।

কোন পলিসি ডিসিশন কিভাবে নেওয়া হয় এবং কিভাবে নেওয়া উচিত তা ভালোভাবে অনুধাবন করতে হবে। উদ্দেশ্য সাধনের পথে যে সমস্ত সমস্যা উদ্ভূত হয়ে থাকে, হচ্ছে এবং হতে পারে এগুলোর অত্যন্ত বিশদ এবং পুংখানু-পুংখ বিবেচনার মাধ্যমেই পলিসি ডিসিশন নেওয়া উচিত। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কি দেখি—পলিসি-ডিসিশন্ কে নেয়, কিভাবে নেয়? অনেক সময়ই পলিসি 'ওপর থেকে, মানে 'টপ লেভেল' থেকে নির্ধারিত করে দেওয়া হয়। অনেক সময় সমস্যা যেমন যেমন উদ্ভূত হচ্ছে 'ঝোপ বুঝে কোপ মারা'র মত তেমন তেমন পলিসি নেওয়া হচ্ছে। আবার অনেক সময় অধঃস্তন কর্মচারীরা উদ্ভূত সমস্যা ও তার সমাধানের কয়েকটি বিকল্প সহ বিবরণী উর্ধতন কর্মচারীর কাছে পেশ করলে, কর্তৃপক্ষস্থানীয় কর্মীরা সবিশেষ বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের অমোঘ পথটি বাৎলে দিচ্ছেন।

কিন্তু কিভাবে পলিসি ডিসিশন্ নেওয়া উচিৎ অর্থাৎ পলিসি বাছাই করার দায় দায়িত্ব কিভাবে নির্বাহ করা উচিত? স্বভাবতঃই সমস্যার সকল দিক, ঘটনা প্রবাহের সকল পারম্পর্য, কর্মসম্পাদন যে ব্যক্তিরা আসলে করবে তাদের মনোভাব ইত্যাদি তাবৎ আংগিকের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষেই কোন পলিসি-ডিসিশনে পৌঁছানো উচিত। যেমন যেমন সমস্যার উদ্ভব হবে তেমন তেমন সমাধানের পথ বাৎলানো হবে—তাৎকালীক বা ad hoc সিদ্ধান্ত নেওয়ার এই প্রবণতা মোটেই বাঞ্ছিত নয়, কেননা এতে সমস্যাটার প্রকৃত সমাধান যেমন হয় না তেমনি অনেক সময় এর ফলেই নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়। জ্যোতিষীর হাত গুণে বলা বা নখ দর্পণে ভূতভবিষ্যৎ দেখা হয়তো সত্যের কাছাকাছি পৌঁছায় কিন্তু জাগতিক ব্যাপার স্যাপারে এ বিদ্যা অচল। একজন ব্যক্তি তা তিনি যত বড় প্রজ্ঞাপারঙ্গম বা ত্রিকালদর্শীই হন না কেন, সকল সিদ্ধান্ত একা নিতে তিনি অক্ষম কেননা একটা সিদ্ধান্তে আসতে গেলে যতগুলো বিষয় যাচাই করা দরকার তা তার একার পক্ষে করা

অসম্ভব। একা একা করতে গেলে নাড়ীটেপা ডাক্তারের রোগ নির্ণয়ের মত অবস্থা হবে। তাছাড়া বর্তমানে যেভাবে বিশেষজ্ঞ বা স্পেশ্যালিষ্টদের যুগ শুরু হয়েছে সেখানে তাদের বক্তব্য না শুনে কোন সমস্যার সমাধানে এগিয়ে গেলে সেটা বিজ্ঞানসম্মত না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। যে কোন ডিসিশনই ব্যক্তি সাপেক্ষ না হয়ে বস্তু-সাপেক্ষ হওয়া উচিৎ। নাড়ীটেপা ডাক্তারের ডাক্তারীতে ব্যক্তিগত সংস্কার, শিক্ষা, অনুভূতি তথা চেতনা মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে বস্তুগত সত্তার ওপর ধোঁয়া বিস্তার করে, কিন্তু সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি যদি বহুজন চিন্তাসাপেক্ষ হয় তাহলে তা অতটা হওয়া সম্ভব নয়।

অভিজ্ঞতাও ডিসিশন নেওয়ার একমাত্র মাপকাঠি হলে মুশকিল। মনোবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী আমরা প্রত্যেকেই, অর্থাৎ উকীল, ডাক্তার, অধ্যাপক, কেরাণী, ব্যবসায়ী, ম্যানেজার মায় চোর-ডাকাত পর্যন্ত সকলেই, একবার যে পদ্ধতিতে কাজ করে কোন কাজে সার্থকতা অর্জন করি, সে পদ্ধতিকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নিই এবং সেই ফর্মুলাই সর্বক্ষেত্রে সকল কাজে ব্যবহারের চেষ্টা করি। এই প্রবণতাও কিন্তু সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরিপন্থী। অভিজ্ঞতার শিক্ষালব্ধ জ্ঞান মাথায় থাকুক কিন্তু তা যেন নবোদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সহায়কমাত্রই থাকে, একমাত্র দিশারী রূপে পরিগণিত না হয়। পলিসি ডিসিশন্ নেওয়ার এবংবিধ বহুরকমের সমস্যা থাকলেও ডিসিশন্ নেওয়া হয় এবং নিতেও হবে। কোন্ পলিসি 'টপ লেভেল' থেকে নির্ধারিত হবে, কোন্ পলিসি 'নীচের থেকে' পুট্ আপ্ করা ফাইলে সই হয়ে সিদ্ধান্তে তৈরী হবে বা কোন্ পলিসি 'এ্যাড্‌হক্' ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে তা স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী-ই স্থিরীকৃত হওয়া উচিত। যেভাবেই হোক না কেন, পলিসি-ডিসিশন নেওয়ার মূলনীতিগুলো অটুট থাকলে কোন পলিসিই অযৌক্তিক, অবাস্তব বা ব্যর্থ হয়ে উঠবে না।

যে কোন একটা সমস্যা সমাধানের জন্য হাজার গণ্ডা বিকল্প পলিসি থাকতে পারে। এর মধ্য থেকে আসলটিকে বেছে বার করা এক সাংঘাতিক ব্যাপার। তাছাড়া প্রত্যেকটি পলিসি ঠিক করতেই যদি সবরকমের বিকল্পগুলোর যাচাই করতে হয় তাহলে যে সময় ও সম্পদ লাগবে তাও এক বিরাট সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। এই সমস্যা সমাধানের উপায় বাৎলে এগিয়ে এলেন কয়েকজন তত্ত্ববিশারদ ব্যক্তি। এরা বল্‌লেন যে incrementalism বা প্রান্তিক পরিবর্তন

বিচারের মাধ্যমেই পলিসি নির্ধারণ করা উচিত। বর্তমানে যে পলিসি অনুযায়ী কাজকর্ম চল্‌ছে—অন্য কোন্ পলিসি তার চেয়ে একটু ভালো ফল দেয় এ মতবাদ অনুযায়ী সেটাই বিবেচ্য। গণ্ডা গণ্ডা বিকল্প পলিসি নিয়ে মাথা ব্যথা করার কোন প্রয়োজন নেই। কয়েকটা বিকল্প নিয়ে নাড়াচাড়া করা যেতে পারে এবং শুধু তাই নয় এদের বিভিন্ন বহুধা-বিভক্ত ফলাফল তথা দোষগুণের বিচার না করে কয়েকটা মুখ্য ফলাফলের বিচার-বিবেচনা করাই যথেষ্ট। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণে সমস্যাটা যেহেতু সতত পরিবর্তনশীল সেজন্য কোন স্থায়ী ও যথাযথ সমাধান অসম্ভব। অতএব শুধুমাত্র প্রান্তিকভাবে কত লাভ হয় তার হিসেবেই পলিসি গ্রহণ করতে হবে।

কিন্তু এই মতবাদকে যারা পুরোপুরি সমর্থন করেন না তাদের বিবেচনায় এটা কোন পলিসি নির্ধারণই নয়। পলিসি গ্রহণ ব্যাপারটাকে আপৎকালীন ব্যবস্থা হিসেবে বিচার করলে রোগীর সাময়িক আরোগ্যলাভ ঘটতে পারে। কিন্তু রোগের সমূল উৎপাটন হবে না। অর্থাৎ নৌকোর গতিপথ পরিচালিত না করে শুধু স্রোতে ভেসে যাতে নৌকো উল্টে না যায় এজন্য নৌকোকে স্রোতের অনুকূলে ভাসিয়ে বসে থাকলে নৌকো না উল্টোতেও পারে কিন্তু নির্ধারিত লক্ষ্যে নির্ধারিত সময়ে পৌছুবে কি না সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা থাকে না। এজন্য আরেকটা মতবাদের জন্ম হল। এখানে বলা হল যে মিশ্র অনুসন্ধান পদ্ধতি বা mixed scanning এর মাধ্যমেই পলিসি নির্ধারিত হওয়া উচিত। সমস্যার সকল দিক তথা পূর্ণাঙ্গ পরিপ্রেক্ষিত এবং তদনুযায়ী বিভিন্ন বিকল্পের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ যেহেতু প্রায় অসাধ্য ব্যাপার সেজন্য বৃহৎ উদ্দেশ্য নির্ধারণের ব্যাপারে incrementalism বা প্রান্তিক পরিবর্তনের মতবাদ অনুযায়ী পলিসি নির্ধারণ করা যেতে পারে। কিন্তু বৃহৎ উদ্দেশ্য/উদ্দেশ্যসমূহ ভাঙিয়ে যে ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যসমূহ পাওয়া যায় সেগুলোর বেলায় উদ্ভূত অনুভূত সমস্যাসমূহের পূর্ণাঙ্গ ও যুক্তিগ্রাহ্য অনুধাবন করতে হবে। সামূহিক ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ পরিপ্রেক্ষিতকে যদি বা বাদ দেওয়া যায় বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত ক্ষেত্র সমূহে পূর্ণাঙ্গ ও পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণকে অবশ্যই উপজীব্য হতে হবে। অর্থাৎ ক্ষুদ্র উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে incrementalism চলবে না, এখানে বিকল্পসমূহের চুলচেরা বিচার করে আসল পলিসি নির্ধারণ কর্‌তে হবে। যেহেতু এখানে বিপরীত প্রান্তিক উভয় পদ্ধতিতেই কাজ কর্‌তে হয় সেজন্য এই মতবাদকে

'মিশ্র অনুসন্ধান' বা Mixed Scanning নামে অভিহিত করা হয়েছে। অতএব দেখা যাচ্ছে যে সমস্যাসমূহের ব্যাপকতা এবং উদ্দেশ্যের প্রকৃতির উপরেই নির্ভর করবে কিভাবে সমস্যাগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হবে।

'পরিকল্পনা' গ্রহণ করার পর যে ব্যাপারটা আসে সেটা হচ্ছে সংগঠন। সংগঠনের অর্থ কি ? এক কথায় বলতে গেলে পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য, পরিকল্পিত উদ্দেশ্যসমূহের সর্বোত্তম পূর্তি সাধনের জন্য, ব্যক্তি ও সম্পদের সন্নিবেশে কাজের কাঠামো তৈরী করার নামই সংগঠন। তাহলে সংগঠন হচ্ছে সেই কাঠামো যার মাধ্যমে আসলে কাজকর্মগুলো সাধিত হয়। সংগঠন কোন প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য নয়, বরং সংগঠন হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার মাত্র। নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কত সহজ, সুন্দর ও সুচারুভাবে সাধিত হবে সেটা নির্ভর করে সংগঠনের কাঠামো সংস্থানের সামর্থ ও সাফল্যের উপর। সংগঠন যেহেতু লৌকিক সংস্থান সেজন্য নির্দিষ্ট কর্ম ও দায়িত্বের বণ্টনের মাধ্যমেই সংগঠনের লৌকিক বিন্যাস হয়ে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে 'পরিকল্পিত উদ্দেশ্যের' সংগে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারিত কর্মের সর্বোত্তম সম্পাদন করা। ম্যানেজার এই দায়িত্ব তথা কর্তব্য নির্ধারিত করে দেয়। কর্ম সম্পাদনের কাঠামো নির্ধারণ বা সংগঠন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এ ব্যাপারে ম্যানেজারের দায়িত্বও অপরিসীম। এখন আমরা সংগঠন পর্যায়ে ম্যানেজারীয় কর্মধারা প্রসংগে একটু বিস্তৃত আলোচনায় অগ্রসর হব।

যে কোন প্রতিষ্ঠানেই বিভিন্ন ধরণের কর্মধারা থাকে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে একটা কর্মধারাই প্রধান এবং অন্যান্যগুলো প্রধান কর্মধারার সহায়ক মাত্র। এই প্রধান কর্মধারাটিকে প্রথমেই চিহ্নিত করে নিতে হবে। যে কোন প্রতিষ্ঠানেই উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সংগে প্রধান কর্মধারাটি একান্তভাবে জড়িত। অতএব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের পর্য্যালোচনার মাধ্যমেই প্রধান কর্মধারাটিকে খুঁজে বের করতে হবে। সব প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মধারা এক নয় কিন্তু আনুষংগিক বা সহায়ক কর্মধারা প্রায় একই ধরনের। সহায়ক কর্মধারাগুলো প্রধান কর্মধারাকে পূর্ত্তির পথে নিয়ে যায় এবং সেজন্যই এগুলোকে সহায়ক বা আনুষংগিক কর্মধারা বলা হয়। দুর্গাপুর ইস্পাত প্রকল্পের প্রধান কর্ম হচ্ছে ইস্পাত উৎপাদন—বিপনন, অর্থ, লোকজন, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি সব

কিছুই সহায়ক কর্মধারা। কিন্তু স্টেট ব্যাংকে প্রধান কাজকর্ম হচ্ছে আর্থিক লেনদেন—অন্যান্য সব কাজকর্মই এই প্রধান কর্মটিকে সাহায্য করবার জন্য পরিচালিত হয়ে থাকে। যে কোন প্রতিষ্ঠানেই এ ভাবে একটা প্রধান কর্ম-ধারা রয়েছে, অন্যান্য কর্মধারাগুলোকে এই প্রধান কর্মধারার মুখাপেক্ষী অবশ্যই হতে হয়।

বিভিন্ন কর্মধারা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য বিভাগীয় পরিচালক বা ম্যানেজার রয়েছেন। বিভাগীয় ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে প্রধান কর্মধারার সর্বোত্তম পূর্ত্তি সাধনের জন্য আপন কর্মধারাকে পরিচালিত করা এবং সংগে সংগে আপন কর্মের জন্য দায়িত্বভাগীও হওয়া। বস্তুতঃ দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য পরস্পর সাপেক্ষ এবং সেজন্যই দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের সামঞ্জস্যপূর্ণ সন্নিবেশের মধ্যেই নিহিত আছে সংগঠনের কার্যকারিতা। দায়িত্বের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুযায়ী আবার কর্মচারীবৃন্দের শ্রেণী-বিন্যাস তথা নিয়ন্ত্রণ হয়ে থাকে এবং এ ব্যাপারে আমাদের hierarchy ও ডেলিগেশন এবং বিকেন্দ্রীকরণ বা decentralisation ইত্যাদি ধারণার তাৎপর্য অনুধাবন করতে হবে।

দায়িত্ব ও কর্মের গুরুত্ব অনুযায়ী কর্মীবৃন্দ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। কে কাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কতখানি নিয়ন্ত্রণ করবে বা কি ভাবে করবে—hierarchyর মূল নীতি ও ধারণা এরই আলোচনা করে। একজন ব্যক্তি যত বড় প্রতিভা-বানই হন না কেন তাঁর একার পক্ষে সব কাজ নিজে করা বা সব ভাবনা নিজেই ভাবা মোটেই সম্ভব নয়। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের চেয়ে বেশী লোকজনের কাজকর্ম প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করা কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্যই কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কাজকর্ম-গুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করে যেমন শ্রমবিভাগ করা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবনা চিন্তার দায়িত্ব তথা একান্ত প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের জন্য "নির্দেশনার শৃঙ্খল" এর ব্যবস্থা রয়েছে। এই শৃঙ্খলের গোড়ায় কে থাকবে, কি তাদের দায়িত্ব হবে, কর্ত্তব্য কতখানি হবে ইত্যাদি "হিয়ারার্কির" ধারণার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। হিয়ারার্কির মূলনীতি আবার প্রধানতঃ দুটো ধারণার উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, Span of control বা নিয়ন্ত্রণের স্বাভাবিক গণ্ডী—অর্থাৎ প্রত্যেক স্তরে দায়িত্বশীল ব্যক্তির পক্ষে কতজন লোকের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বা কতখানি দায়িত্ব নির্বাহ করা সম্ভব তা নিয়ন্ত্রণের

স্বাভাবিক গণ্ডী অনুযায়ী নির্ধারণ করতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, Chain of Command বা নির্দেশনার শৃঙ্খল—অর্থাৎ কে কাকে নিয়ন্ত্রিত করবে বা কার দ্বারা কতখানি নিয়ন্ত্রিত হবে এ ব্যপারটা নির্দেশনার শৃঙ্খলের মাধ্যমে স্থিরিকৃত হয়ে থাকে।

নির্দেশনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ বিভিন্ন ব্যক্তির উপর যেমন বিভিন্ন দায়িত্ব ন্যস্ত করতে হয় ঠিক তেমনি সেই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য ক্ষমতাও দিতে হয়। বস্তত: সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা ব্যতিরেকে ন্যস্ত দায়িত্বের যথা-যথ সম্পাদন সম্ভব নয়। তাই দায়িত্ব ও কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতারও বিন্যাস করতে হবে। ক্ষমতার এই বিন্যাস দুভাবে করা যায়—বিকেন্দ্রীকরণ এবং ডেলিগেশন। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বলতে বোঝায় যে সংশ্লিষ্ট তাবৎ ক্ষমতা কর্মসম্পাদনকারীরই উপর ন্যস্ত রয়েছে অর্থাৎ দায়িত্ব ও ক্ষমতা একই সাথে নির্দেশনার শৃঙ্খলে সুনির্দিষ্ট রয়েছে। ডেলিগেশন কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণ থেকে ভিন্ন। ক্ষমতার ডেলিগেশন বলতে বোঝায় যে কোনও এক বিশেষ ক্ষমতা কর্মসম্পাদনের সুবিধের জন্য ক্ষমতা-কেন্দ্র থেকে অধীনস্থ ব্যক্তির উপরে সাময়িকভাবে ন্যস্ত করা হয়। এক কথায় বললে দাঁড়ায় যে ডেলিগেশন হচ্ছে নির্দেশনার শৃঙ্খলে ক্ষমতা—মাথা থেকে হাত পায়ের উপর সাময়িকভাবে ন্যস্ত করা। বিকেন্দ্রীকরণ বা ডেলিগেশন উভয় পদ্ধতিরই কিছু সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে। কোন্ কোন্ ক্ষমতা ডেলিগেট করা হবে আর কোন্ কোন্ ক্ষমতা পুরোপুরি বিকেন্দ্রীকৃত করা হবে তা কর্মসম্পাদন তথা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের সর্বোত্তম স্বার্থের মাপকাঠিতেই বিবেচনা করতে হবে। দায়িত্ব ও ক্ষমতা যেখানে পুরোপুরিভাবে সন্নিবেশিত করা যায় সেখানে বিকেন্দ্রীকরণ সম্ভব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে শুধুমাত্র কাজকর্ম সুষ্ঠু-ভাবে সম্পাদন করার জন্য ক্ষমতা ন্যস্ত করা যায়, সেখানে ডেলিগেশন ছাড়া অন্য উপায় থাকে না।

এই প্রসঙ্গেই Line ও Staff কর্মধারার কথা চলে আসে। প্রধান কর্ম-ধারা এবং সহায়ক বা আনুষংগিক কর্মধারার যে আলোচনা আমরা করলাম, সেখানে প্রধান কর্মধারার পরিবর্তে "লাইন" ও সহায়ক কর্মধারার পরিবর্তে "স্টাফ" কর্মধারা বললেই "লাইন" ও 'স্টাফ' কর্মধারা সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়। প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য যে কর্মধারার সাথে সবচেয়ে বেশী

প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ও সম্বন্ধযুক্ত সেই কর্মধারাই "লাইন" কর্মবৃত্তের মধ্যে পড়ে। আর এই "লাইন" কর্মবৃত্তকে সার্থক ও সফল ক'রে তোলার জন্য যে সকল কাজ কর্ম রয়েছে সেগুলোই 'স্টাফ' কর্মবৃত্তের অঙ্গীভূত। লাইন কর্মবৃত্তের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য যেহেতু একান্তভাবে জড়িত সেজন্য "লাইন" কর্মধারায় যে সমস্ত ডিসিশন নিতে হয় সেগুলোর প্রভাব প্রত্যক্ষ এবং তাৎক্ষণিক। অপর দিকে 'স্টাফ' কর্মবৃত্তে যে সমস্ত ডিসিশন নিতে হয় সেগুলোর প্রভাব অপ্রত্যক্ষ এবং দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতেই সেগুলো ফলাফল দ'ন করে। হেড অফিস বা হেড কোয়ার্টারের লোকজন দুই একদিন বা দুই এক সপ্তাহ এমন কি দুই এক মাস কোনও সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফাইলের উপর ঘুমাতে পারে। কিন্তু "লাইন" বা "ফিল্ড্" কর্মধারার কর্মনায়কদের তা করলে চলবে না—তৎক্ষণাৎ সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং কাজের চাকা এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অতএব হেড অফিসের কাজকর্মের প্রভাব দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে বিচার্য আর সত্যিকারের কাজের কাজী যারা অর্থাৎ "লাইনের" লোকজন তাদের কাজকর্ম স্বল্প মেয়াদের ভিত্তিতে বিচার করতে হবে। আগুনে হাত লাগলে আমরা সঙ্গে সঙ্গে হাত সরাই, এর জন্য মস্তিষ্কের নির্দেশের প্রয়োজন হয় না কেননা "পার্মানেণ্ট রিফ্লেক্স" অনুযায়ীই সেটা ঘটে থাকে। ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ এই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যৌক্তিকতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত করতে হবে। অন্যদিকে কাজকর্মের নিয়ন্ত্রণ ও কো-অরডিনেশনের স্বার্থে ও সুবিধার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমতার ডেলিগেশন করতে হবে। ফায়ার-বিগ্রেড যখন আগুন নেভাতে যায় বা পুলিশ যখন কোনও মারমুখী জনতার সম্মুখীন হয় তখন যে সমস্ত কর্মীরা,—তা তিনি যতই নিম্নতম পর্যায়ের হোন না কেন—ঘটনার মুখোমুখী পড়ে যান, তাদেরই দায়িত্ব সহকারে এর মোকাবিলা করতে হবে। এই দায়িত্ব নির্বাহ করার মত পর্যাপ্ত ক্ষমতা এই কর্মীদের থাকা উচিত। অতএব ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা ডেলিগেশন যাই করা হোক্ না কেন এর একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে যাবতীয় কাজকর্ম ও কর্মধারার সুষ্ঠু সম্পাদন নিশ্চিত করা। শরীরের সকল অংগ প্রত্যংগ অর্থাৎ মাথা, বুক, পেট, হাত, পা ইত্যাদি যদি পরস্পর সাপেক্ষতার ভিত্তিতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কাজ না করে তাহলে শরীরের সামগ্রিক সুস্থতা থাকে না। ঠিক তেমনি 'লাইন' ও 'স্টাফ' কর্মবৃত্তের অংশভাগী কর্মীদের মধ্যে যদি সহযোগী মনোবৃত্তি না থাকে তা হলে

সংগঠন ঠিকমত পরিচালিত হবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে HQ বনাম field বা Line ও Staff এর মধ্যে দ্বন্দ্ব খুব বেশী দেখা যায়। ম্যানেজারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ এই প্রসংগে রয়েছে—সেটা হচ্ছে লাইন ও স্টাফের এই চিরাচরিত দ্বন্দ্বকে যতদূর সম্ভব সীমিত রাখা এবং বিভিন্ন কর্মবৃত্তের অংগীভূত কর্মীবৃন্দের মধ্যে সহযোগী মনোবৃত্তির উন্মেষ নিশ্চিত করা।

সংগঠনের সংজ্ঞা প্রসংগে আমরা আগেই বলেছি যে সংগঠন হচ্ছে একটা কর্ম-কাঠামো এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের শৃঙ্খলে লোকজনের যৌক্তিক বিন্যাসের মাধ্যমেই সংগঠনের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ঘটে থাকে। সংগঠন যেহেতু একটা লৌকিক সত্ত্বা সেজন্য লোকজনই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। ফলতঃ ব্যক্তির সংগে ব্যক্তি, ব্যক্তির সংগে গ্রুপ এবং বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সংগঠনের কর্মপ্রবাহ সচল থাকে। যেখানেই কিছু ব্যক্তি এক সাথে এক কর্ম আবহের পরিমণ্ডলে মিলিত হয় সেখানে কিছু 'গ্রুপ' গড়ে ওঠে। এটা প্রাকৃতিক নিয়ম—একে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই গ্রুপগুলোর উদ্দেশ্য ও আশা-আকাঙ্খা যদি সাংগঠনিক উদ্দেশ্যের সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলেই গণ্ডগোল। বস্তুতঃ সংগঠনের সাফল্যের পেছনে আছে ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনা ও আশা আকাংখার সঙ্গে সংগঠনের আশা-আকাংখার সামঞ্জস্য সংস্থাপন—ব্যক্তি যদি সংগঠনের সাথে একাত্ম না হয় তাহলে সংগঠন সর্বোত্তম কর্ম-কাঠামো স্থাপন করতে কখনও পারে না। অতএব ম্যানেজারকে সবসময় একথা মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তি যেন সংগঠনের কাঠামো, কার্যাবলী, সম্পর্ক, পদ্ধতি, প্রথা ইত্যাদির মধ্যে পরিতৃপ্তি খুঁজে পায় এবং সাংগঠনিক উদ্দেশ্য সম্পাদনে আপন সামর্থ্য ঢেলে দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত একাত্মতা অনুভব করে। এ অনুভব যে সংগঠনে অনুপস্থিত সে সংগঠন কখনও বড় বা ভাল হতে পারে না।

সংগঠন একটা স্বচ্ছন্দ সুসংবদ্ধ কর্ম-কাঠামো এবং ব্যক্তিই যেহেতু কর্ম-কাঠামোর আণবিক সত্তা সেজন্য সংগঠনের স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখতে হলে এই ব্যক্তি অণুকে কর্মোদ্যোগে যথাযথভাবে সামিল করতে হয়। ব্যক্তির সংগে ব্যক্তির সম্পর্ক 'স্প্যান অফ, কণ্ট্রোল' বা 'হিয়ারার্কির' ধারণাসমূহ না হয় নির্ধারণ করল। কিন্তু ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং মূল্যবোধ তথা ব্যক্তিগত শক্তিমত্তা বা যোগ্যতা এগুলো কিন্তু উপরোক্ত ধারণাসমূহের বাইরের ব্যাপার। ম্যানেজারের

দায়িত্ব হচ্ছে এ কথাটা মনে রেখে 'নির্দেশ' সৃষ্টি করা। 'নির্দেশ' পর্যায়ে ম্যানেজারীয় কর্মধারা ব্যক্তিগত কর্মোদ্যম নিয়েই ব্যস্ত থাকে। ব্যক্তিগত কর্মসমূহ বা কর্মধারা যাতে সংগঠনের প্রধান কর্মধারার পরিপন্থী না হয় সেটা লক্ষ্য রাখতে হবে। ফলতঃ ম্যানেজারকে কিছু ব্যবস্থা বিধি প্রণয়ন করতে হয়, যা সকল স্তরের কর্মীকেই মেনে চলতে হয় এবং যা কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কর্মীবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পথ প্রদর্শন করে। প্রতি পদক্ষেপে কর্মীবৃন্দকে নির্দেশিত করার বা এটা কর ও ওটা কোর না বলার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তাতে কর্মপ্রবাহ প্রায়ই স্তব্ধ হয়ে পড়ে। প্রয়োজনীয় নিয়মকানুনগুলো এমনভাবে সংগঠনে প্রবহমান্ রাখতে হবে যাতে কর্মীবৃন্দ নিজে থেকেই এগুলো মেনে চলে। কালক্রমে, অনুসৃত নিয়মকানুন বা বিধি-ব্যবস্থা পরিবর্জন বা পরিবর্ধনেরও প্রয়োজন হতে পারে, কেননা কিছুই বসে থাকছে না এবং সময়ের অনুপাতে উৎপাদন কর্ম-পদ্ধতি, টেক্‌নিক্ এবং উৎপাদন সম্পর্ক সব কিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। অতএব এখানেও 'চিরস্থায়ী' বলে কোন কথা নেই এবং নির্দেশাবলীও পরিবর্তনের অপেক্ষা রাখে। ব্যক্তিগত কর্মোদ্যমকে সাংগঠনিক কর্মোদ্যোগে পুরোপুরি সামিল করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিধি প্রণয়ন এবং দরকার মত এর আবশ্যিক পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের যে কাজকর্ম এগুলোই ম্যানেজারের 'নির্দেশ' পর্যায়ের কর্মধারার অংগীভূত।

নির্দেশিত কর্মধারাসমূহ যদি সংগঠনের প্রধান ও মূল উদ্দেশ্যের অভিমুখী তথা মুখাপেক্ষী না হয় তাহলে সংগঠন তার লক্ষ্যে পৌছতে পারে না। বিভিন্ন কাজকর্ম এবং কর্মধারাসমূহ আপাত বিরোধী হতে পারে। কিন্তু যতই ভিন্ন বা বিপরীতমুখী হোক না কেন এই কাজকর্মগুলো তথা কর্মধারাসমূহের মধ্যে একটা ঐক্যাভিমুখী সামঞ্জস্য না থাকলে সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য অর্জনের ব্যাপারে সিদ্ধিলাভ কখনো করা যাবে না। অতএব পরবর্তী পর্যায়ে ম্যানে-জারের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে একটা সহযোগী ঐক্যাভিমুখী চেতনা সঞ্চালিত করা। এই পর্যায়কে 'সহযোগিতা' পর্যায় নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই পর্যায়ের ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং এই সংযোগকে এক সামঞ্জস্যপূর্ণ সহযোগী ঐক্যাভিমুখী উদ্যোগে পরিণত করা।

কর্মধারাসমূহ নির্দেশ অনুযায়ী সহযোগিতার পথে চল্‌লেও তা যে সবসময়ই তর্‌তর্‌ করে কোন বাধাবিঘ্ন ব্যতিরেকে চলবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলতঃ ম্যানেজারের পরবর্তী দায়িত্ব হচ্ছে কাজকর্ম এবং কর্মধারাসমূহ যাতে সর্বদা বাঞ্ছিত পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় চলে তা নিশ্চিত করা। ম্যানেজারের এই পর্যায়ের কাজকর্মকে 'নিয়ন্ত্রণ' বলে অভিহিত করা হয়।

ম্যানেজারের কার্যাবলীর এই যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম তাতে পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশ, সহযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ এই কয়েকটি পর্যায়ের কথা আমরা বলেছি। এক হিসেবে দেখতে গেলে ম্যানেজারের কাজকর্ম প্রধানতঃ পরিকল্পনা ও সংগঠন এই দুভাগেই বিভক্ত করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে নির্দেশ, সহযোগ এবং নিয়ন্ত্রণ—সংগঠন পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। সংগঠন বলতে যে কর্ম-কাঠামো বোঝান হয় সেটা যেহেতু কোন স্থানু পদার্থ নয় বরং একান্তভাবেই ব্যক্তিক এবং সেজন্যই চলিষ্ণু—ফলতঃ এই চলিষ্ণু সতত পরিবর্তনশীল ও প্রাণময় কর্মসত্তাকে কর্মময় ও ফলপ্রসূ করার জন্য নির্দেশ, সহযোগ তথা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন আছে। তাই এই কর্মপ্রচেষ্টাগুলোকে বৃহত্তর দৃষ্টিতে সংগঠন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

॥ ৩ ॥

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশ

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান কি, ম্যানেজার কে, ম্যানেজারের কাজকর্ম কি—এই প্রশ্নগুলো আলোচনার পরে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগতে পারে যে, ম্যানেজমেণ্ট নিয়ে মাতামাতি তো অত্যন্ত সাম্প্রতিক কালের ব্যাপার, তাহলে অতীতে শিল্প বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলো 'ম্যানেজমেণ্ট' ছাড়া কেমন করে চলেছে ? বিশেষতঃ ম্যানেজার কে এবং কী তার কাজকর্ম এগুলো পর্যালোচনা করলে এটা বেশ বোঝা যায় যে এই ধ্যানধারণাগুলো খুব একটা নতুন কিছু নয় এবং যে কোন প্রতিষ্ঠানের সার্বিক বিকাশের পেছনে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের ধারণাগুলো বরাবরই কাজ করে এসেছে। বস্তুতঃ ম্যানেজমেণ্ট নামটাই নতুন—এর অনেক প্রিন্সিপল্স্ ও টেক্‌নিক্স্ অর্থাৎ এককথায় মূলনীতিগুলো তখনও মেনে চলা হত। শুধু তাহাই নয় এমনকি বিভিন্ন বৃহদায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের অভিজ্ঞতা এবং অর্জিত অভিজ্ঞতার পর্যালোচনার ভিত্তিতেই যে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের জন্ম এবং ক্রমবিকাশ সম্ভব হয়েছে সে কথা বললেও মোটেই অত্যুক্তি করা হবে না। ব্যবহারিক কাজকর্মের অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনুসৃত নীতি ও ধারণাসমূহের অনুশীলন এবং কাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের একসাথে পর্যালোচনা ইত্যাদির যুক্তিনিষ্ঠ সন্নিবেশ ও বিচারের ফলেই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের উৎপত্তি এবং এখনও এইভাবেই এই বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান পরিধি প্রসার লাভ করছে। তাই এই বিজ্ঞানের আলোচনায় এর ক্রমবিকাশের ইতিহাস অবশ্য পাঠ্য। আমরা তাই এখন ম্যানেজমেণ্ট চিন্তার ক্রমবিকাশের ধারার এক সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাবার চেষ্টা করব। আমাদের এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে কেননা ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাস নিয়েই অনেক-গুলো বই লেখা চলতে পারে।

ফ্রেডেরিক উইনস্লো টেলর্ (১৮৫৬-১৯১৭)

টেলর্‌কে আধুনিক ম্যানেজমেণ্ট্ শাস্ত্রের জনক বলা হয় কেননা তিনিই প্রথম এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। টেলরের জীবন অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ফিলাডেল্‌ফিয়ায় মিড্‌ভেল ষ্টীল্‌ ওয়ার্কস-এ তিনি সাধারণ শ্রমিক হিসেবে জীবন শুরু করেন এবং শেষ পর্যন্ত ঐ প্রতিষ্ঠানেই চীফ্‌ এঞ্জিনীয়র পদে উন্নীত হন। কিছু দিনের জন্য তিনি বেথ্‌লেহেম্‌ ষ্টীল্‌ ওয়ার্কসের পরিচালনাও করেছিলেন। অবসর গ্রহণের পর টেলর্‌ উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে গেছেন।

মিড্‌ভেল্‌ এ থাকতেই টেলর্‌ উৎপাদন বাড়াবার জন্য বিভিন্ন কর্মপদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন। *'Shop Management'* (১৯০৩) *'The Principles of Scientific Management'* (১৯০৯) এবং *'Testimony before the Special House Committee'* (১৯১২) এই পুস্তকগুলোতেই তার চিন্তাধারা বিধৃত হয়েছে। পরে অবশ্য এই বইগুলো 'Scientific Management নামে একত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

টেলর মনে করেন যে ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে নিয়োগকর্ত্তা ও নিযুক্ত কর্মচারীদের সর্বাধিক অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন করা। শ্রমিক ও মালিক উভয়েরই আসল স্বার্থ এক, কেননা উভয়েরই উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক উন্নতি। কিন্তু বাস্তবে শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মোটেই সুন্দর ও সহজ দেখা যায় না। এর উত্তর দিতে গিয়ে টেলর তিনটে কারণ দেখিয়েছেন। প্রথমতঃ, শ্রমিক ভাবে যে সে যদি সর্বাধিক উৎপাদন দেয় তাহলে সে নিজেই তার ছাঁটাই এবং বেকারত্বের পথ সুগম ক'রে তুলবে। দ্বিতীয়তঃ, পরিচালন পদ্ধতি এমন ত্রুটিপূর্ণ ও অযৌক্তিক যে শ্রমিকের এই ভয় কমানো তো দূরের কথা পরিচালন ব্যবস্থাই শ্রমিকের সে ভয় আরও বাড়িয়ে দেয়। তৃতীয়তঃ, যে কর্মপদ্ধতি শিল্পব্যবস্থায় অনুসৃত হচ্ছে, তা অত্যন্ত কম উৎপাদনশীল ও ত্রুটিপূর্ণ। টেলর মনে করেন এই তিনটে কারণেই একদিকে যেমন উৎপাদন কম হচ্ছে, অন্য দিকে তেমনি শ্রমিক-মালিক সম্পর্কও ভালো হচ্ছে না।

এই ত্রুটিগুলো নির্ধারণ ক'রেই টেলর ক্ষান্ত হলেন না। এই ত্রুটিগুলো দূর করার জন্য তিনি "বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টে"র কথা বললেন। "বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের" ধারণা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে গিয়ে টেলর প্রধান চারটে মূলনীতির কথা বললেন। মূলনীতিগুলো হচ্ছে নিম্নরূপ : প্রথমতঃ কর্ম সম্পাদন করার এক বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নিরূপণ করতে হবে যার ফলে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের দ্বারা যুক্তিসম্মতভাবে ব্যবস্থা থাকবে। দ্বিতীয়তঃ, কর্মচারীর নিয়োগ বিজ্ঞানসম্মতভাবে করতে হবে এবং কর্মীবৃন্দকে আপন

প্রবণতা অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করতে হবে। তৃতীয়তঃ, উপরোক্ত এই দুটো মূলনীতিকে এমনভাবে মেলাতে হবে যে ন্যূনতম উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতম মজুরী দেওয়া সম্ভব হবে। চতুর্থতঃ, শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে।

এই মূলনীতিগুলোর ভিত্তিতে টেলর যে ব্যবহারিক সমাধান দিলেন তা বেশ আকর্ষণীয়। তিনি বললেন শ্রমিক-মালিক সহযোগিতা যদি স্বেচ্ছায় না আসে, তা হলে মালিককে গায়ের জোর খাটিয়ে তা আনতে হবে। তাঁর মতে শ্রমিকের অবাধ্যতা মালিকের পক্ষে কখনও সহ্য করা উচিত হবে না। কাজ করার বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি একটা কাজকে অনেকগুলো বিশেষ কাজে বিভক্ত করার নির্দেশ দেয়। পূর্ণ শ্রম-বিভাগের নীতি অনুসরণ ক'রে কাজগুলোকে যে শুধু বিভক্ত করতেই হবে তা নয় দক্ষতা ও পারদর্শিতার তারতম্যের ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ কাজে উক্ত কাজের উপযুক্ত শ্রমিককেই নিযুক্ত করতে হবে। কর্মীরা "Differential Piece-rate" অনুযায়ী মজুরী পাবে। কর্মপদ্ধতিতে 'specialisation' বা বিশেষায়ন আনাই যেহেতু বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের লক্ষ্য সেজন্য একজন শ্রমিককে আটজন specialist সুপারভাইজারের কথা শুনে কাজ করতে হবে। এই ব্যাপারটাকে টেলর "Functional Management" (ফাংশনাল ম্যানেজমেণ্ট) নামে অভিহিত করলেন।

অত্যন্ত সাধারণভাবে বলতে গেলে এই হচ্ছে টেলরের কাজকর্মের মূলকথা।

হেনরী লরেন্স গ্যাণ্ট্ (১৮৬১-১৯১৯)

এর পরেই যার কথা বলতে হয় তিনি হচ্ছেন, গ্যাণ্ট্। ১৮৭০ সালে মিড্‌ভেল ষ্টীল এ তিনি খোদ টেলরেরই সহকারী হিসেবে কাজ আরম্ভ করলেন, ম্যানেজমেণ্ট সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা ও হাতে-কলমে কাজ তখন থেকেই শুরু হয়। মূলতঃ তিনি ছিলেন একজন প্রযুক্তিবিদ কিন্তু পরে সময়, উৎপাদন ব্যয় ও রেকর্ড রাখা সম্পর্কিত কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টাতে পরিণত হন। তাঁর বিস্তৃত অভিজ্ঞতার ফলস্বরূপ তিনি অনেক বই ও প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার কয়েকটা হচ্ছে—"Work Wages and Profits' (১৯১০) Industrial Leadership (১৯১৬), Organisation for Work (১৯১৯) ইত্যাদি।

তিনি টেলরের "ডিফারেন্সিয়াল পিস্ রেট্" অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে এ ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি দেখতে পেলেন এবং তাই "টাস্ক্ এণ্ড বোনাস" পদ্ধতি আবিষ্কার করে সে অনুযায়ী মজুরি নির্ধারণ করলেন। বিজ্ঞান সম্মতভাবে নির্ধারিত বিশেষ কোন কাজ বা দায়িত্বের যথাযথ পূর্তির সঙ্গে মজুরীর সঙ্গে সংযোগ সাধন করাই এ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মূল্যায়ণের এক চার্ট উদ্ভাবন করলেন যা পরবর্তীকালে 'গ্যাণ্ট্ চার্ট' নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিল। "ডিফারেন্সিয়াল পিস্ রেট্" থেকে "টাস্ক্ এণ্ড্ বোনাস রেট" আবিষ্কার করতে গিয়ে তিনি প্রসঙ্গতঃ দেখলেন যে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক এবং তার মনোবৃত্তিই আসল গেরো অর্থাৎ ভাবনার বিষয়।

ফ্র্যাঙ্ক গিলবার্থ (১৮৬৮-১৯২৪)

কোন কাজ করার সবচেয়ে ভালো উপায় কি—আজীবন গিলবার্থ এই উপায় খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর চিন্তাধারা অনেক বইপত্রে বিবৃত হলেও *Cheaper by Dozens* নামক বই ও চলচ্চিত্র তাঁর চিন্তাধারা ও নাম সমগ্র বিশ্বে প্রচার করেছে।

মাত্র ১৭ বছর বয়সে রাজমিস্ত্রীর এ্যাপ্রেন্টিস্ হিসেবে কাজ শুরু করে পরে ঐ কোম্পানীতেই প্রধান কার্যনির্বাহক হওয়া এবং অবশেষে নিজস্ব কনষ্ট্রাকশন্ কোম্পানী শুরু করা কোনো সামান্য ব্যাপার নয়।

আপন ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গিলবার্থ দেখলেন যে সবচেয়ে বেশী আরামদায়ক অবস্থায় থেকে সবচেয়ে কম নড়াচড়া করে কোন কর্মসম্পাদন করাই ঐ কাজ করার সবচেয়ে ভালো উপায়। তার এই ধারণাকে "মোসন্ স্টাডি" নামে অভিহিত করা হয়েছে। তিনি দেখলেন যে কোনো রকমের কাজে ১৭ রকমের নড়াচড়া অর্থাৎ মোসন্স্ দরকার—নিজের পদবীকে উল্টোপাল্টা করে লিখে তিনি এর নাম দিলেন *THERBLIGS*। তাঁর আরেকটা অবদান হচ্ছে—"ফ্লো প্রেসেস্ চার্ট"।

টেলর যেমন বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের জনক তেমনি গিলবার্থ মোসন্ স্টাডির জনক যা পরবর্ত্তীকালে "মাইক্রো-মোসন স্টাডি" বা "সাইকেল গ্রাফ" ইত্যাদির জন্ম দিয়েছে।

টেলর্, গ্যাণ্ট ও গিলবার্থ এই তিনজন ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রথম

ভিত্তিস্থাপন করলেন এবং এই তিনজনের কর্মকৃতি বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের ত্রিভুজ সম্পূর্ণ করল। এদের যুগ্মভাবে "এফিসিয়েন্সী এক্সপার্ট"ও বলা হয়ে থাকে ; কারণ এরা কাজের সময়, কর্ম-পদ্ধতি এবং বহিরংগ পরিবেশের এক আদর্শ সম্মিলন ঘটিয়ে শ্রমিকের উৎপাদন বাড়াতে চেয়েছিলেন। এরা ভেবে-ছিলেন বহিরংগ পরিবেশের পরিবর্তনেই শ্রমিকের উৎপাদন বেড়ে যাবে। এরা ভেবেছিলেন শ্রমিকের প্রধান লক্ষ্য কত বেশী মজুরী পাওয়া যায়। এরা আরও ভেবেছিলেন যে, ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক শ্রমিকের আশা-আকাঙ্খা, মনোবৃত্তি ইত্যাদির যোগফলেই কর্মরত সকল শ্রমিকের আশা-আকাঙ্খা মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব এদের এই ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলোকেই একত্রে বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের প্রধান অংগ বলা যেতে পারে।

একটা ব্যাপার যেটা বেশ লক্ষ্যণীয় ভাবে ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে এই যে এই তিনজনই অত্যন্ত ক্ষুদ্রভাবে জীবন শুরু করেছিলেন। আপন দক্ষতা ও কর্মক্ষমতায় এই তিনজনই জীবনে উন্নতির চরম শিখরে ওঠেন। তাঁদের নিজেদের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা,পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফল হিসেবেই ম্যানেজ-মেণ্ট চিন্তার সূত্রপাত ঘটে। এঁদের সমস্ত পর্যালোচনা ও গবেষণার পেছনে যে মূল প্রেরণা কাজ করেছে তা হচ্ছে কি করে আরো বেশী কাজ পাওয়া যায়। অর্থাৎ উৎপাদন কি করে আরো বাড়ানো যায়।

এদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যে বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের জন্ম হল তার ধ্যান-ধারণাগুলোকে গুঁড়িয়ে দিয়ে মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনের (Human relations management) সূত্রপাত ঘটে, এবং তারই ফল হিসেবে 'বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্ট' 'ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে' পরিণত হয়। বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্ট থেকে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে উত্তরণ বা বিকাশ 'হদর্ন পরীক্ষা' থেকেই শুরু হয়। কাজেই ম্যানেজমেণ্ট চিন্তার ইতিহাসে 'হদর্ন পরীক্ষা' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকচিহ্ন। 'হদর্ন পরীক্ষা' আলোচনার আগে আমরা আরো দুজন ব্যক্তির চিন্তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করব, কেননা ম্যানেজমেণ্ট চিন্তার ইতিহাসে এদের অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হেনরী ফেয়ল্ (১৮৪১-১৯২৫)

টেলরের সাথে ফেয়লের জীবনের অনেক মিল আছে অথচ দুজনের দৃষ্টি-কোণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। ফরাসী মাইনিং কোম্পানি Commentry-Fourcham-

boult—Decazeville তে তিনি ইঞ্জিনীয়র, ম্যানেজার ও পরে ম্যানেজিং ডিরেক্টর পর্যন্ত হয়েছিলেন। ফেয়ল যদিও অনেক পুস্তক রেখে গেছেন, তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত পুস্তকের নাম—Administrative Industrialle et Generals।

টেলরের মত ফেয়লও তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে করতে সংগঠনের কার্যাবলীকে ম্যানেজমেণ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু টেলর উৎপাদন পদ্ধতির দ্বারা এতটা প্রভাবিত ছিলেন যে তাঁর ম্যানেজমেণ্ট চিন্তা উৎপাদন পদ্ধতির সংকীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে বিশেষ এগোয়নি। অন্য দিকে ফেয়ল কোনও বিশেষ কর্মধারার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত ছিলেন না বলে তাঁর চিন্তাধারা খানিকটা সামগ্রিক ও সাধারণ রূপ নিয়েছে। পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ ছিল টেলরের মূলমন্ত্র আর ফেয়লের সহায়ক ছিল সংগঠনের বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে তার সুদীর্ঘকালের কাজকর্ম ও অভিজ্ঞতা।

শিল্প সংগঠনের কাজকর্মকে ফেয়ল কতকগুলো কর্মধারাতে ভাগ করেন। যেমন, টেকনিক্যাল, কমার্শিয়াল, ফিন্যান্সিয়াল, একাউনটিং, ম্যানেজেরিয়াল ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটা কর্মধারাকে সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করে, তাদের কার্যক্ষেত্রের পরিধি নির্ধারিত করে তিনি ম্যানেজমেণ্ট চিন্তাধারায় সংগঠনের সামগ্রিক রূপ তুলে ধরেন। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ম্যানেজেরিয়াল কর্মধারার সংজ্ঞা নিরূপণ করা। প্রত্যেকটি কর্মধারার প্রধানই সেই সেই কর্মধারার ম্যানেজার এবং তার দায়িত্ব ঐ কর্মধারার পরিধির সঙ্গে একান্ত সম্পৃক্ত। পরিকল্পনা, সংগঠন, নির্দেশ, সহযোগিতা এবং নিয়ন্ত্রণ এই কয়েকটি বিষয়কে তিনি ম্যানেজেরিয়াল কর্মধারার অন্তর্গত বলে মনে করেন। ফলতঃ ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে এই বিষয়কটি সুষ্ঠুভাবে নিষ্পন্ন করা। 'পরিকল্পনার' অর্থ হচ্ছে ভবিষ্যতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তদনুযায়ী কর্মপদ্ধতি স্থির করা আর 'সংগঠন' করার অর্থ হচ্ছে শ্রম ও সম্পদের সুষ্ঠু সম্মিলনে একটা কার্যকরী কাঠামো গড়ে তোলা। 'নির্দেশ' দ্বারা ফেয়ল সমস্ত কর্মচারীর মধ্যে কর্মধারাকে সজীব রাখার কথাই বুঝিয়েছেন। 'সহযোগিতা' দ্বারা তিনি প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় কর্মধারার মধ্যে ঐক্য ও সংযোগের কথাই বুঝিয়েছেন। আর নিয়ন্ত্রণের দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন যে প্রতিষ্ঠিত নিয়মকানুন ও নির্দেশ মান্য করে যে কাজকর্ম চালান হচ্ছে সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া।

ম্যানেজমেণ্টের কাজের এই যে সংজ্ঞা ফেয়ল দিয়েছেন তা আজও সর্বজনমান্য। এ ছাড়াও তিনি ম্যানেজমেণ্টের ১৪টা মূলনীতি নির্ধারিত করেন এবং দায়িত্ব ও কর্তৃত্বকে সংবদ্ধ করে ডেলিগেশন সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ধারণা প্রকাশ করেন। ম্যানেজারীয় কাজকর্ম প্রসংগে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা এই ধারণাগুলোর বিস্তৃততর আলোচনা করেছি।

মেরী পার্কার ফলেট্ (১৮৬৮-১৯৩৩)

কাজকর্ম, জীবন, চরিত্র সবাকিছুতে শ্রীমতী ফলেট্, টেলর্ বা ফেয়ল্ থেকে আলাদা। তিনি হার্ভার্ড ও কেমব্রিজে রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি অধ্যয়ন করেন। তিনি এক বিশিষ্ট সমাজসেবিকা ছিলেন—যুবক ও তরুণদের মধ্যে employment এবং vocational guidance নিয়ে কাজকর্ম করতে করতে তিনি শিল্প ও ব্যবসায় জগতের কাছাকাছি আসেন। তিনি দেখেন যে সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্যা নিয়ে তিনি নাড়াচাড়া করছেন ম্যানেজমেণ্টকেও এ সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে। তিনি মনোবিজ্ঞানের পটভূমি থেকে মানুষের শ্রমের সর্বোত্তম ব্যবহার নিয়ে চিন্তা শুরু করলেন *Dynamic Administration —the collected papers of Mary Parker Follett (ed. Metcalf and Urwick)* নামক সঙ্কলন গ্রন্থে।

মানবিক অনুভূতি ও মনোবৃত্তি কিভাবে সংগঠনকে প্রভাবিত করে এটাই তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল। তিনি মনে করেন যে যখন কয়েকজন মানুষ একত্র হয় তাদের গোষ্ঠিসত্তা ও মনোবৃত্তি নতুন করে গঠিত হয় যা আলাদাভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কর্তৃত্ব, নেতৃত্ব নিয়ন্ত্রণ—এ ধারণাগুলো কোনো পরম সত্য নয়, পরিবেশ ও ঘটনার রকমফের এগুলোর চরিত্র নির্ধারণ করে। তাই বিজ্ঞানসম্মত সমাধান হচ্ছে এগুলোকে ব্যক্তি-সাপেক্ষ না করে তোলা। তিনি আরও বললেন যে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে তফাৎ ও পার্থক্য রয়েছে তারই স্বীকৃতি হচ্ছে 'বিরোধে'র অস্তিত্বে এবং কোনও কাজ করতে গিয়ে ব্যক্তির পার্থক্যের জন্য যে ব্যর্থতা দেখা যায় সেটা 'বিরোধ' নয়—'বিরোধ' অস্বীকারেরই ফল। একদিকে যেমন, একই গোষ্ঠী বা গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা এবং তাদেরই সমাহারে গঠিত গোষ্ঠীসত্তার মধ্যে মূলগত ঐক্য থাকলেও পার্থক্য রয়েছে—অন্যদিকে তেমনি

বিভিন্ন গোষ্ঠী বা গ্রুপের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। এই পার্থক্যের জন্যই সংগঠনের বিভিন্ন স্তরভূক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতামতের তারতম্য বিবাদ-বিসম্বাদ দেখা দেয়। এই ব্যাপারটাকেই 'বিরোধ' বলা হয়েছে। এই 'বিরোধের' উদ্ভব যেহেতু মানবচরিত্রের গতিপ্রকৃতির সংগে সংগতিপূর্ণ, সেহেতু স্বাভাবিক। তাই একে মেনে নিয়ে ঠিকপথে চালনা করে অভীপ্সিত লক্ষ্যে পৌছানোই হচ্ছে ম্যানেজারের আসল কর্ম। ফলেট্ আরোও বললেন যে এমন কি অত্যন্ত সাধারণ লোকও ভালো করে বোঝালে যুক্তির কাছে নমনীয় হয়, যে কোন বিশেষ ঘটনাসংস্থান বা সিচ্যুয়েশনের যুক্তি ও চাহিদা বেশ ভালো-ভাবে উপলব্ধি করতে পারে এবং সত্যকে সত্য বলে মেনে নিতে দ্বিধা করে না। ফলতঃ যে কোন স্তরের কর্মীকেই, যদি কোন বিশেষ ব্যাপার ভালো করে না বুঝিয়ে দেওয়া যায় বা যদি তার পক্ষে যুক্তিগ্রাহ্য করে না তোলা যায় তাহলে ঠিকমত কাজ আদায় করা যায় না।

বস্তুতঃ ফলেট্ই প্রথম মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে ম্যানেজমেণ্ট চিন্তায় আলোকপাত করেন। তাঁকে তাই 'মানবিক সম্পর্ক আন্দোলনের' প্রথম পথিকৃত বললে অন্যায় বলা হয় না। এবারে আমরা জর্জ এণ্টন্ মেয়ো এবং হদর্ন পরীক্ষা আলোচনা করে 'মানবিক সম্পর্ক আন্দোলন' ব্যাপারটা কি তা অনুধাবন করার চেষ্টা করব।

জর্জ এণ্টন্ মেয়ো (১৮৮০-১৯৪৭)

চিকিৎসা শাস্ত্রের ছাত্র হিসেবে মেয়ো জীবন শুরু করেন কিন্তু মনোবিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেবে তার ছাত্রজীবন পরিসমাপ্তি লাভ করে। হার্ভার্ডে অধ্যাপনা করতে ঢুকে শেষ পর্যন্ত তিনি শিল্প গবেষণা সংক্রান্ত বিভাগে প্রধান অধ্যাপক হন। শ্রীমতী ফলেটের মত তাঁর চিন্তাধারাও সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি ও গ্রুপের সম্বন্ধেই বেশী বিস্তার লাভ করে। তাঁর সর্বাধিক প্রচারিত পুস্তক দুখানির নাম: *The Human Problems of an Industrial Civilization* এবং *The Social Problems of an Industrial Civilization.* পুস্তক দুখানির নামই তাঁর গবেষণার বিষয়ে পর্যাপ্ত আলোকপাত করে। কিন্তু তাঁর প্রধান কৃতিত্ব হচ্ছে হদর্ন পরীক্ষা যার জন্য তার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

হথর্ন এক্সপেরিমেণ্ট বা হথর্ন পরীক্ষা (১৯২৭-৩২)

ওয়েষ্টার্ন ইলেকট্রিক কোম্পানী তখনকার দিনের আমেরিকার অন্যতম বিখ্যাত কোম্পানী। সেই ১৯২৭ সাল নাগাদই শ্রমিকদের জন্য পেন্‌সন্, অবসর-বিনোদনের সুযোগ ইত্যাদি নানা রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা এই কোম্পানী করেছিল। কিন্তু কোম্পানীর কর্মকর্তারা দেখলেন যে ওঁদের ২৯০০০ শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ মোটেই কম নয়; এবং উৎপাদন ও সামগ্রিকভাবে কেমন যেন ঝিম্ মেরে গেছে—কিছুতেই বাড়ছে না। বহু রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও শ্রমিক কর্মচারীরা কিছুতেই উৎপাদন বাড়াচ্ছে না। কোম্পানীর কর্মকর্তারা তাই অধ্যাপক মেয়োর নেতৃত্বে হার্ভার্ড গ্র্যাজুয়েট স্কুল অব বিজনেস্ এ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসনের একটা গ্রুপকে এই ব্যাপারে কারণ অনুসন্ধান করতে গবেষণা কার্য্যে নিয়োগ করলেন।

তখনকার দিনে টেলর প্রচারিত বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টই হচ্ছে ম্যানেজমেণ্ট্ শাস্ত্রের ব্যাপারে আপ্তবাক্য। তাই স্বাভাবিক ভাবেই মেয়ো এবং তাঁর সহকর্মীরা টেলর প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হলেন। কাজের পরিবেশ, কর্মপদ্ধতির ত্রুটিজনিত কারণে অতিরিক্ত পরিশ্রম ও ক্লান্তি, অতিরিক্ত মোশন্‌স্-জনিত কারণে সময়ের অপব্যয়, আর্থিক মজুরীর অবৈজ্ঞানিক বিন্যাস ও অপ্রতুলতা ইত্যাদি এঁদের গবেষণার প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো। এঁরা ঠিক করলেন যে পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উৎপাদন না বাড়ার প্রধান কারণগুলোকে নির্ণয় ক'রে ওগুলোর প্রতিবিধান বাতলে দেবেন।

পরীক্ষার প্রথম পর্যায়ে এঁরা পাঁচজন মহিলা শ্রমিক বেছে নিলেন যাঁরা টেলিফোন রিলে এ্যাসেম্ব্‌লির কাজ করতেন। এই শ্রমিকরা একজন সুপারভাইজারের তত্ত্বাবধানে একটা নির্দিষ্ট ঘরে ওঁদের কাজ শুরু করলেন। দেখা গেল যে সময়ের প্রতি-তুলনায় কাজের হার বেড়ে গেছে। অবশেষে দেখা গেল যে বর্তমানে এঁরা সপ্তাহে ৪২ ঘণ্টার হিসেবে যে কাজ করছেন, তা পূর্বেকার সপ্তাহে ৪৮ ঘণ্টার কাজকর্মের সমান। যেহেতু কাজের পরিবেশ ভাল করা হয়েছিল সেই জন্যে উৎপাদনের হার বেড়েছে। এবারে যে বিশেষ সুবিধাগুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো তুলে নেওয়া হলো, প্রাত্যহিক বিশ্রামের সময় বন্ধ করে দেওয়া হলো এবং ৪৮ ঘণ্টার সপ্তাহ চালু করা হলো। এর ফলে উৎপাদনের হার কিছু কমলো বটে, কিন্তু সামগ্রিক উৎপাদন ৪৮ ঘণ্টার

সপ্তাহের বা ৪২ ঘণ্টার সপ্তাহের উৎপাদনকে ছাড়িয়ে গেল। এবারে আবার একে একে প্রদত্ত সুবিধেগুলো চালু করা হলো। দেখা গেল যে উৎপাদনের হার বাড়ছে। অবশেষে যখন আবার ৪২ ঘণ্টার কাজের সপ্তাহ চালু করা হলো তখন দেখা গেলো যে উৎপাদন সর্বকালীন রেকর্ডে পৌছেছে। পণ্ডিতেরা হতভম্ব হয়ে গেলেন কেননা শ্রমিক কর্মচারীগণ কোনও কিছু গ্রাহ্য না করে সর্ব অবস্থাতেই উৎপাদন বাড়িয়ে চলেছেন। এ ধরণের ফলাফলের জন্য অধ্যাপক মেয়ো বা তার সহকর্মীরা কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্ট তত্ত্ব অনুযায়ী এই রকম হওয়া মোটেই উচিত নয়। কর্ম পরিবেশের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি যদি অবশ্যম্ভাবী হয় তা হলে বিপরীতটাও সত্য; অর্থাৎ পরিবেশের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে উৎ-পাদনের পরিমাণ কমাও স্বাভাবিক। গবেষকরা বুঝলেন যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়ার আসল কারণগুলো ওরা বুঝতে পারেন নি, শ্রমিকেরা কেন সর্বাবস্থায় উৎপাদন বাড়িয়ে তুলেছে তার কারণ বুঝতে পারেন নি। ওরা তাই ঠিক করলেন যে এই ব্যাপারে নূতনভাবে ওরা গবেষণা শুরু করবেন।

পরীক্ষার দ্বিতীয় পর্যায়ে 'মেয়ো গ্রুপ' ভাবলেন যে কারখানার সামগ্রিক পরিস্থিতিটা খতিয়ে দেখা দরকার। কাজের পরিবেশ, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে শ্রমিকগণের বক্তব্য জানলেই উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধির আসল কারণ জানা যাবে। তাই তারা সমগ্র প্রতিষ্ঠান জুড়ে 'সাক্ষাৎকার' গ্রহণ করার ব্যবস্থা নিলেন। কিন্তু এখানেও আশ্চর্য ব্যাপার, শ্রমিকগণ এ ব্যাপারে মোটেই কথা বলল না। বরং কোম্পানীর দৃষ্টিভংগী, সুপারভাইজরের দৃষ্টিভংগী ও শ্রমিকদের সাথে তাদের সম্পর্ক, বিশেষ বিশেষ কাজ সম্পর্কে শ্রমিকের ধারণা ও বক্তব্য—এই ব্যাপারগুলোর ওপরেই শ্রমিকগণ তাদের বক্তব্য ও মন্তব্য জানাল। গবেষকরা যে তিমিরে ছিলেন সে তিমিরে না থাকলেও, যে কারণগুলো জানার জন্য তাদের গবেষণা সে ব্যাপারে তারা বেশী এগুতে পারলেন না।

এবারে এরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার তৃতীয় পর্যায় শুরু করলেন। চোদ্দজন শ্রমিক ও চারজন সুপারভাইজরের একটা গ্রুপকে এরা অলক্ষিতভাবে লক্ষ্য করে চললেন। ওদের উদ্দেশ্য ছিল ব্যবহারিক কর্মধারা খতিয়ে দেখা ও তৎসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা। এবারে এদের চেষ্টা ফলবতী হল। অলক্ষিতে থেকে

একদল লোকের কাজকর্ম দেখে এই 'ষ্টাডি-গ্রুপ' শ্রমিকের দৃষ্টিভংগী সম্বন্ধে অনেক নতুন কথা জানতে পারলেন। দেখা গেল যে এই কর্মীগ্রুপের নিজস্ব একটা code of conduct বা আচরণবিধি রয়েছে যা বিধিবদ্ধ সাংগঠনিক আচরণবিধির বাইরে। উৎপাদন 'খুব বেশী' ও 'খুব কম' করার মাঝামাঝি একটা পর্য্যায়ে এরা উৎপাদনকে বেঁধে রেখেছে। সুপারভাইজরের সংগে সাধারণ শ্রমিকের গা মাখামাখি বার্তালাপ সমগ্র গ্রুপ মোটেই পছন্দ করে না, আবার যারা খুব বেশী চুপচাপ এবং আত্মনিমগ্ন, সমগ্র গ্রুপ এদের সন্দেহের চোখে দেখে। যে সমস্ত কর্মীরা গ্রুপের নিজস্ব ধ্যান-ধারণার সঙ্গে খুব বেশী খাপ্ খাইয়ে নিয়ে গ্রুপের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত তারাই গ্রুপের লীডার বা নেতারূপে গণ্য হয়। গ্রুপের স্বকীয় আদর্শ ও ধারণার প্রতি সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের দায়িত্ব ও আনুগত্য এমনকি সহানুভূতি, সামগ্রিক সংগঠনের প্রতি আনুগত্যের চেয়ে অনেক বেশী। এমন কি এ আনুগত্য ও সহমর্মিতা ব্যক্তি-শ্রমিকের অধিক মজুরীর প্রতি আকাংখা ইত্যাদির তুলনায়ও অনেক বেশী। এক কথায় বলতে গেলে গ্রুপের প্রতি আনুগত্য সবার আগে।

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত বিস্তৃত সময় জুড়ে অধ্যাপক মেয়ো ও তার সহকর্মীরা যে সমস্ত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন, এরই সংঘবদ্ধভাবে নাম দেওয়া হল 'হথর্ন পরীক্ষা'। এই হথর্ন পরীক্ষার মূল ধারাটার কথাই আমরা ওপরে বললাম।

এই হথর্ন পরীক্ষা প্রাক্তন সমস্ত ধ্যানধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানল। দেখা গেল যে, কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে কর্ম-পরিবেশের উন্নতি, কর্মপদ্ধতির বৈজ্ঞানিক পরিবর্তন ইত্যাদি মোটেই যথেষ্ট নয়। কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক অবস্থাই সর্বাধিক গুরুত্ব-পূর্ণ। টেলিফোন রিলে পরীক্ষায় উৎপাদন বেড়েছিল কেননা শ্রমিকগণ নিজেদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছিল। ওরা বুঝেছিল যে প্রতিষ্ঠানের সকলেরই নজর ওদের উপর। এই স্বীকৃতি ও উপলব্ধি এবং তজ্জনিত আত্ম-পরিতৃপ্তিই সকল অবস্থায় তাদের উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে উদ্দীপিত করেছিল।

মানুষ, মানুষের দৃষ্টিভংগী ও তার পরিবর্তন, মানুষে মানুষে সম্পর্কের প্রকৃতি ও প্রকরণ ইত্যাদির গুরুত্ব উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বোঝা গেল বলেই হথর্ন পরীক্ষা থেকে 'মানবিক সম্পর্কের আন্দোলন' জন্মলাভ করেছিল। উৎপাদনের

ক্ষেত্রে মানুষই যে প্রধান বিবেচ্য বিষয় এবং মানবিক ধ্যানধারণা, চিন্তাধারা ও অনুভূতিই যে উৎপাদনশীলতার আসল নির্ধারক—মানবিক সম্পর্কের আন্দোলন এ কথাটাই স্পষ্ট করে তুলে ধরল। অধ্যাপক মেয়ো দেখলেন যে এতাবৎকাল সমস্ত শিল্প সংগঠনে শ্রমিক এবং শ্রমিকের মানসিক চেতনা ভীষণভাবে উপেক্ষিত। 'বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্ট' চিন্তা অনুযায়ী ম্যানেজমেণ্ট শ্রমিককে কেবলমাত্র অর্থকরী যন্ত্র বলেই ভাবে, অর্থাৎ অর্থ উপার্জন এবং জীবনধারণ ছাড়া শ্রমিকের আর কোন চিন্তা বা ইচ্ছা নেই। এক কথায় বলতে গেলে সাধারণ শ্রমিককে মনুষ্যেতর এক প্রকার জীবের চেয়ে কোন বেশী মর্যাদা দেওয়া হয় না। এই সমস্ত ধারণা এবং তজ্জনিত অবহেলার ফলে সাধারণ-ভাবে শ্রমিকগণের মধ্যে এক ধরণের বিষণ্ণ চিন্তা জন্মায়, শ্রমিকেরা নিজেদের সবসময় বঞ্চিত ভাবে এবং এক নিরানন্দ, নেতিবাচক উদ্দীপনাহীন পরিমণ্ডলে অদ্ভুত এক সহায়হীন অবস্থায় এরা দিন যাপন করে। এই অসহায় অবস্থাকে অধ্যাপক মেয়ো সামগ্রিকভাবে ANOMIE নামে অভিহিত করেছেন। উৎপাদন পদ্ধতি ও পরিবেশের শিকার হয়েই শ্রমিকদের মধ্যে এই সহায়হীনতার সৃষ্টি হয়। সমাজে সামগ্রিকভাবে 'অ্যানমি' রয়েছে যার প্রতি-ফলন প্রতিনিয়ত সাহিত্য, শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতিক্ষেত্রেই প্রকাশ পায়। সাধারণ শ্রমিকের প্রতি দৃষ্টিভংগী সামাজিক হলেও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে এ মনোভংগীর কারণ হচ্ছে ম্যানেজমেণ্টের নেতিবাচক ধারণাগুলো। সামন্ত-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় সমাজের সকল নীচের ধাপে যেমন কৃষকের স্থান, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঠিক তেমনি সবচেয়ে নীচের ধাপে শ্রমিকের স্থান। এই ধারণা বিভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কারণে উদ্ভূত এবং ফলত: শিল্প প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজাররা ব্যক্তিগতভাবে শুধু যে এই ধারণার পরিপোষক তাই নয় পরি-বর্ধকও বটে। সাধারণ শ্রমিকগণ ভারবাহী গাধার দলের চেয়ে বেশী কিছু নয় অর্থাৎ এদের মন-টন বলে কিছু নেই—এই যে ধারণাগুলো ম্যানেজারদের মনে ভিত্তিমূল হয়ে রয়েছে এবং এরা স্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য বলে মেনে নিয়েছে, এই ধারণাসমূহকেই অধ্যাপক মেয়ো 'র‍্যাবল হাইপোথিসিস্' নামে অভিহিত করেছেন। এইসব মানববিরোধী ধারণাকে নস্যাৎ করে শ্রমিককে স্বীকৃতি দিয়ে, মর্যাদা দিয়ে এবং মানুষে মানুষে মানুষ হিসেবে পারস্পরিক সম্পর্ককে সর্বাধিক গুরুত্বের স্থান দিয়ে মেয়ো 'মানবিক সম্পর্কের আন্দোলনে'র সূত্রপাত

করলেন। ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্র 'বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের' নিগড় থেকে মুক্ত হয়ে 'ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে' পরিণত হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করল।

মেয়ো প্রদর্শিতভাবে সার্থকভাবে এগোলেন ম্যাক্‌গ্রেগর। কিন্তু তার আগে একজন মনোবিজ্ঞানীর কথা বলে না নিলে যেমন ম্যাক্‌গ্রেগরের চিন্তাধারা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে না তেমনি চিন্তাধারার বিকাশের পারম্পর্যও রক্ষিত হবে না।

আব্রাহাম ম্যাস্‌লো

ম্যাস্‌লোর পঠন-পাঠন ও গবেষণা ম্যানেজমেণ্ট নিয়ে নয়। মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপনাই তাঁর কাজ—তাঁর তাত্ত্বিক পুস্তক *Motivation and Personality* (১৯৫৪) বস্তুতঃ আরও অনেক বিষয়ের সাথে ম্যানেজমেণ্ট চিন্তায়ও প্রভাব বিস্তার করেছে।

ম্যাস্‌লোর বক্তব্য হচ্ছে যে মোটিভেশন্ অর্থাৎ মানুষের 'স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধ' হওয়া কতকগুলো প্রয়োজন বা চাহিদার পূর্তির ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ মানুষ যা চায় তার জন্যই কোমর বেঁধে এগোয় কিন্তু এই চাওয়া বা পাওয়ার ইচ্ছা সকলের জন্য সমান নয়। তাছাড়া যা চাওয়া যায় তা অধিগত হয়ে গেলেই অন্য চাওয়া এসে ভীড় জমায়। একবার কোন কিছু পাওয়া গেলে মানুষ অন্য কিছু প্রাপ্তির আশায় ছোটে। ম্যাস্‌লো এই প্রাপ্তিগুলোকে প্রয়োজনের গুরুত্ব অনুযায়ী একের পর এক সাজিয়ে মানুষের চাহিদা-আকাংখা-প্রয়োজনের একটা চিত্র প্রদান করেন। তার মত অনুযায়ী, মানুষের চাহিদা প্রয়োজনের সিড়িভাঙ্গার ছন্দ অনুসারে চলে।

জৈবিক প্রয়োজন যথা ক্ষুধা তৃষ্ণা মেটানো এই সিঁড়িভাঙ্গা ছন্দের একদম নিম্নতম ধাপে অবস্থিত। অন্ন, বস্ত্র, গৃহের সমস্যাই মানুষের মৌল সমস্যা—এই সমস্যাগুলো মেটাতেই মানুষের সকল প্রচেষ্টা। কিন্তু এই সমস্যাগুলো মিটে গেলেই মানুষের সকল চেষ্টা শেষ হয়ে যায় না। বরং বলা যায় আকাজ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার শুরু হয়। মানুষ তখন চায় নিরাপত্ত', সুরক্ষা, স্বীকৃতি ইত্যাদি। একের পর এক এগুলো অধিগত হয়ে গেলে মানুষের যখন আর জাগতিক চাওয়ার তেমন কিছু থাকে না তখন মানুষের মনে আত্মানুসন্ধানের আকাঙ্খা জাগ্রত হয়। মানুষ তখন নিজেকে জানতে চায় ও বুঝতে চায়। জৈবিক

প্রয়োজন থেকে আত্মানুসন্ধান—এই যে উত্তরণ, মনোবিজ্ঞানী ম্যাস্‌লো একে পাঁচটি ধাপে বিভক্ত ক'রে একটা ছকের মাধ্যমে দেখান। একেই ম্যাস্‌লোর "Scale of Motivation" বলা হয়।
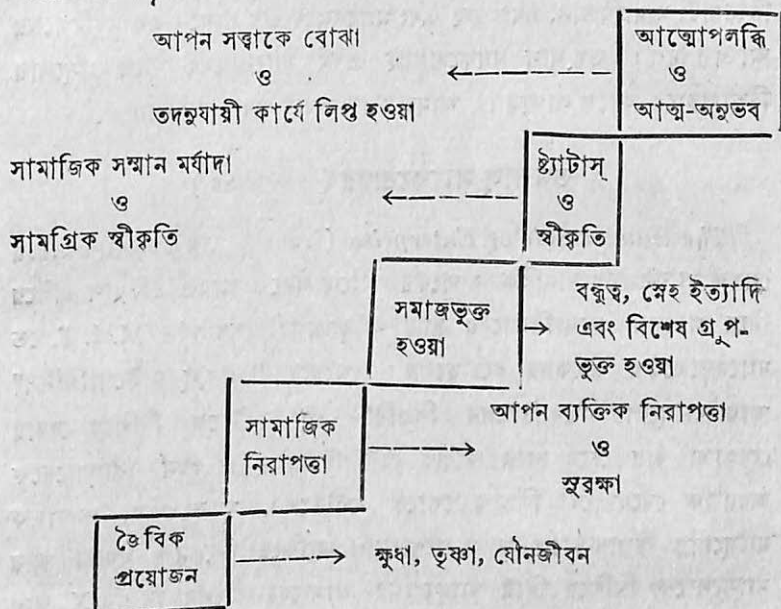
চতুষ্কোণ বন্ধনীর অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনগুলো দেখানো হয়েছে। এই প্রয়োজনগুলোই মানুষের বিশেষ বিশেষ আকাঙ্খার সৃষ্টি করে। ফলতঃ আকাঙ্খা নিবৃত্তির জন্য মানুষ সচেষ্ট হয়, উদ্বুদ্ধ হয়, কর্মে প্রণোদিত হয়। 'মোটিভেশন'—স্বেচ্ছা উদ্বুদ্ধতা বা স্ব-প্রণোদনা বাংলায় যে নামেই বলা যাক না কেন—আসলে প্রয়োজন মেটানোর হাতিয়ার ছাড়া অন্য কিছু নয়।

মানুষের মন এক বিচিত্র ব্যাপার। এই মনের কুল কিনারার হদিশ এখনো পর্যন্ত কিছুই পাওয়া যায় নি বললেই হয়। কিন্তু তবুও মানুষের যাবতীয় কর্মধারার পেছনে মনোবৃত্তির এই যে সংস্থানের খোঁজ ম্যাস্‌লো দিলেন, তা এককথায় অভূতপূর্ব। এতদিনে মানুষের কর্মপ্রণোদনার একটা যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। ম্যাস্‌লোর এই কর্মকৃতি ম্যানেজমেণ্ট চিন্তায় এক নতুন পথের সন্ধান দিল। মানুষের প্রয়োজন এবং আকাংখাগুলো ম্যাস্‌লো যেমন দেখিয়েছেন, সেভাবে একের পর একই আসে, না একই সাথে বিভিন্ন

প্রয়োজন ও আকাংখা উদ্ভূত হয়—এ নিয়ে অনেক যুক্তি-তর্কের অবকাশ রয়েছে। ম্যাস্‌লো যে পাঁচটা ধাপ দেখিয়েছেন, তদরিক্ত অন্য কোনও পর্যায় আছে কিনা এ নিয়েও দ্বিমত থাকতে পারে। কিন্তু ম্যাস্‌লোর এই চিন্তাধারা মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ব এবং ম্যানেজমেণ্টের সামনে এক নবদিগন্তের আভাস দিল। ডগ্‌লাস্ ম্যাক্‌গ্রেগরই প্রথম ম্যানেজমেণ্ট তত্বে ম্যাস্‌লোর চিন্তাধারাকে কাজে লাগান। আমরা তাঁর কথায় এবার আসব।

ডগলাস্ ম্যাকগ্রেগর (······—১৯৬৪)

The Human Side of Enterprise (১৯৬০) নামক বিখ্যাত গ্রন্থের লেখক ম্যাক্‌গ্রেগর মানবিক সম্পর্কের আন্দোলনকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। মনোবিজ্ঞানের ছাত্র ম্যাক্‌গ্রেগর শেষ পর্যন্ত M. I. T. তে ম্যানেজমেণ্টের প্রফেসর হয়েছিলেন। মেয়োর "র‍্যাব্‌ল্ হাইপোথিসিস" আর ম্যাস্‌লোর "মোটিভেশন থিওরি"—এই দুটোকে মিলিয়ে দেবার যোগ্যতা তাঁর চেয়ে আর কারুর বেশী ছিলো না। হদর্ন পরীক্ষা থেকে অধ্যাপক মেয়ো যে সিদ্ধান্তগুলোতে পৌছলেন, ম্যাক্‌গ্রেগর, অধ্যাপক ম্যাস্‌লোর চিন্তাধারাকে তার পাশাপাশি সাজিয়ে নিলেন। মেয়ো আর ম্যাস্‌লোকে মিলিয়ে দিয়ে ম্যাক্‌গ্রেগর আমাদের দিলেন থিওরি X আর থিওরি Y। বস্তুতঃ থিওরি X ও থিওরি Y হচ্ছে বর্তমানকালে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে সর্বাধিক ব্যবহৃত ও আলোচিত তত্ব। ম্যাকগ্রেগরের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত পুস্তক *The Professional Manager* (১৯৬৭) তাঁর চিন্তাধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে।

মানুষের পারম্পরিক সম্পর্ক এবং কাজকর্মের প্রতি, কর্মীমানুষের প্রতি, শ্রমিকের প্রতি সাধারণ মানুষ তথা কর্মকর্তাস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী, এগুলো সম্বন্ধে এতদিন ধরে যে সমস্ত ধ্যানধারণা প্রচলিত আছে—সামগ্রিকভাবে এই সমস্ত ধারণাকে ম্যাক্‌গ্রেগর থিয়োরী X নামে অভিহিত করলেন। আরো নির্দিষ্ট করে বললে বলা যায়, ঠিক এই ধারণাগুলো নয়, এই ধারণাগুলোর পেছনে যে সমস্ত পূর্ব-সিদ্ধান্ত বা সংস্কারগুলো কাজ করছে সেগুলোকেই ম্যাক্‌গ্রেগর থিয়োরী X নামে চিহ্নিত করলেন। এই পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ীই আধুনিক সমাজ ও শিল্পব্যবস্থার সাধারণ শ্রমিকের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে এবং

এগুলোর ভিত্তিতেই শ্রমিক-কর্মচালক সম্পর্ক নির্ধারিত হচ্ছে। অত্যন্ত সাধারণভাবে এবং এককথায় বলা যায় যে এই পূর্ব সিদ্ধান্ত বা assumptions গুলো হচ্ছে : মানুষ সাধারণভাবে স্বভাবতঃ অলস, কুঁড়ে, শ্রমবিমুখ, অর্থলোভী, বিশ্বাসের অযোগ্য, উদ্দীপনাহীন, উচ্চাকাংখাহীন ইত্যাদি। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত-গুলো কি পরীক্ষিত সত্য? না কি এগুলো আমাদের মনগড়া সংস্কার? এগুলোর কি সত্যিই কোন ভিত্তি আছে?

দর্শন পরীক্ষার ভিত্তিতে দেখা গেল যে এতাবৎকাল প্রচলিত এই ধারণা-গুলো মোটেই স্বতঃসিদ্ধ সত্য নয়। তাছাড়া ম্যাস্লোর মত অনুযায়ী মানুষের মোটিভেটেড্ হওয়া বা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধ হওয়া কতকগুলো প্রয়োজন পূর্তির ওপর নির্ভরশীল। মানুষের সকল কর্মপ্রণোদনা যদি থিয়োরী X অনুযায়ী নির্ধারিত হয় তাহলে মানুষ কোনদিনই স্বেচ্ছাউদ্বুদ্ধ হবে না। ফলতঃ থিয়োরী X-এর বিপরীতপ্রান্তিক ধারণাগুলোকে একত্র করে ম্যাক্‌গ্রেগর থিয়োরী Y প্রদান করলেন। ম্যাক্‌গ্রেগর বললেন যে থিয়োরী Yর ধারণাগুলো যদি ম্যানেজমেণ্ট গ্রহণ করে এবং তদনুযায়ী কর্ম পরিচালনা করে তাহলে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক উৎপাদন পাওয়া যাবে, কেননা স্বেচ্ছা উদ্বুদ্ধ মানুষই আসল কাজের কাজী। এর কাছ থেকে যত কাজ পাওয়া যাবে অন্য কারো কাছে তা পাওয়া যাবে না। থিয়োরী Yর সিদ্ধান্তগুলো এককথায় বললে এই রকম : মানুষ সাধারণ-ভাবে স্বভাবতঃ কাজ করতে ভালোবাসে, দায়িত্ববহন করতে চায়, উচ্চাকাংখী, উদ্দীপনাময় ইত্যাদি। ম্যানেজমেণ্ট যদি এই ধারণাগুলোর ওপরে পরিপূর্ণ বিশ্বাস রেখে কর্ম পরিচালনা করে, কাজকর্মগুলোকে এমনভাবে সংগঠিত করে যে কাজকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদনে শ্রমিকগণ তৃপ্তি ও আনন্দ খুঁজে পায়—তাহলে কাজকর্ম একটা দায় বা বোঝা না থেকে খেলাধূলার মত স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক হয়ে যায়, শ্রমিককে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না, শ্রমিকগণ স্বাভাবিক ভাবেই স্ব-নিয়ন্ত্রিত হয়।

থিয়োরী Yকে বর্তমানে অনেকেই soft বা নমনীয় বলে বিবেচনা করে থাকেন। আমরা পরে থিয়োরী X ও থিয়োরী Yর বিস্তৃততর ও তুলনামূলক আলোচনা করব। এখানে শুধু ম্যাক্‌গ্রেগরের অবদান প্রসংগে এগুলোর অবতারণা করা গেল।

ফ্রেডেরিক হার্জবার্গ

বিশিষ্ট ম্যানেজমেণ্ট বিশেষজ্ঞ হার্জবার্গ-এর মতে কাজকর্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীই হচ্ছে কাজকর্মের সাফল্য অসাফল্যের একমাত্র নিয়ামক ও নির্ধারক। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কিভাবে গড়ে ওঠে সে কথা বলতে গিয়ে হার্জবার্গ দু-ধরণের উপাদানের কথা বলেছেন। তার মতে অসন্তোষের নিবৃত্তি আর সন্তোষের উৎপত্তি এক কথা নয়, এই দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ রয়েছে। প্রথম ধরণের উপাদান যেগুলোকে তিনি 'হাইজিন ফ্যাক্টর' নামে অভিহিত করেন সেগুলোর অভাবে অর্থাৎ সেগুলো না থাকলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে ওঠে। এগুলো হচ্ছে উচ্চ মজুরী, বিভিন্ন রকমের সুযোগ সুবিধা, কাজের ভালো পরিবেশ ও কর্ম-আবহ ইত্যাদি। এগুলো অসন্তোষ কমায় বা অনেকাংশে দূর করে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে এগুলো থাকলেই সাধারণ শ্রমিক এত সন্তুষ্ট হবে যে তারা কাজটাকে ভালো ভাববে বা কাজে প্রেরণা পাবে, অর্থাৎ এককথায় স্ব-উদ্বুদ্ধ হয়ে আপন সমস্ত সামর্থ কর্মসম্পাদনে নিয়োজিত করবে। এর জন্য চাই দ্বিতীয় ধরনের উপাদানগুলোর আবশ্যিক উপস্থিতি ও পূর্তি। এগুলো হচ্ছে স্বীকৃতি, বিশ্বাস, মর্যাদা, দায়িত্ব ইত্যাদি। প্রত্যেকটি কাজের সাথে এই উপাদানগুলোকে এমনভাবে সংযুক্ত করতে হবে যে কাজটার সাফল্যজনক সম্পাদনকে শ্রমিক একটা চ্যালেঞ্জের জবাব ভাববে, একটা অ্যাচিভ্‌মেণ্ট ভাববে। এই উপাদান-গুলোকে হার্জবার্গ 'মোটিভেটরস্' বলেছেন। আমরা পরে হার্জবার্গের চিন্তাধারার বিস্তৃততর আলোচনায় আসব।

ক্রীস্ আরগীরিস

ব্যক্তির ওপর সংগঠনের প্রভাব নিয়ে আরগীরিস অনেক বই লিখেছেন। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশনের অধ্যাপক আরগীরিসের সর্বাধিক খ্যাত বইগুলো হচ্ছে *Interpersonal Competence and Organizational effectiveness* (১৯৬২) এবং *Integrating the Individual and Organization*(১৯৬৪)। তার বইয়ের নামগুলো দেখেই একথা বেশ বোঝা যায় যে তিনি ব্যক্তি ও সংগঠনকে পারস্পরিকভাবে মেলাতে চেয়েছেন। তার মতে প্রত্যেক মানুষ ইম্‌ম্যাচিওরিটি থেকে ম্যাচিওরিটির পথে উত্তরণের চেষ্টায় সতত ব্যস্ত ও

নিমগ্ন। ম্যানেজমেণ্টকে একথা মনে রেখে কি কাজকর্ম, কি প্রশাসন, কি নিয়ন্ত্রন ইত্যাদি যাবতীয় সব কিছুতে সর্ব অবস্থায় এমন ব্যবস্থা রাখতে হবে যে শ্রমিক যেন আরো বেশী ম্যাচিওর হয়ে উঠতে পারে এবং নিজেকে আরো বিকশিত করতে পারে। T গ্রুপ এবং সেনসিটিভিটি ট্রেনিং নামক দুটো বহুল প্রচারিত ধারণার প্রসারের জন্যও তিনি বিখ্যাত।

রেনসিস্ লিকার্ট

যুগপৎ মনোবিজ্ঞানী ও সমাজতত্ত্ববিৎ রেনসিস লিকার্ট মিচিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে সামাজিক গবেষণা সংক্রান্ত ইনষ্টিটিউটের প্রধান। *New Patterns of Management* (১৯৬১), *Human Organization* (১৯৬৭) ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

তাঁর মতে যে কোন সংগঠনই একটা জটিল সিস্টেম। যে কোন সংগঠনকেই এক, দুই, তিন, চার—এই চারটি সিস্টেমের একটা continum বা পরাবৃত্ত বা রেখার মধ্যে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা যায়। লিকার্ট চারটে সিস্টেমে নিম্নলিখিতভাবে সকল প্রকার সংগঠনকে পর্যায়ভুক্ত করেন :

প্রথম—শোষণমূলক কর্তৃত্ব
দ্বিতীয়—উদারনৈতিক কর্তৃত্ব
তৃতীয়—পরামর্শমূলক কর্তৃত্ব এবং
চতুর্থ—যোগদানমূলক কর্তৃত্ব

সংগঠনে কি ধরনের পরিচালন পদ্ধতি অনুসৃত হয় তার ভিত্তিতেই লিকার্ট এই শ্রেণীবিভাগ করেছেন। আমরা এই সিস্টেমগুলোর আলোচনায় পরে আসব। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে প্রথম সিস্টেমে থিয়োরী Yর পূর্ব সিদ্ধান্ত বা ধারণাগুলো কাজ করছে। তাছাড়া লিকার্টের আরেকটা বিশেষ অবদান হচ্ছে এই যে তিনিই প্রথম জমি, বাড়ী বা মেশিন-পত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন, যা নিয়ে গবেষণা এখনও চলছে।

ডঃ রবার্ট ব্লেক

টেক্সাস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের ভূতপূর্ব অধ্যাপক ব্লেক বর্তমানে একজন বিখ্যাত ম্যানেজমেণ্ট উপদেষ্টা। ডঃ জেন্, এস, মটনের সঙ্গে লিখিত

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলো হচ্ছে—*Management Grid : Key Orientations for Achieving Production Through People* (১৯৬৪) এবং *Corporate Excellance Through Grid Organization Development* (১৯৬৮)। লিকার্ট, আরগীরিস্, ম্যাক্‌গ্রেগর ইত্যাদি বিভিন্ন পূর্বসূরীদের চিন্তাধারাকে একত্র সংহত ও সংবদ্ধ করে এবং উৎপাদন ও শ্রমিকের সংগঠনের আগ্রহ ও দৃষ্টির তুলনামূলক সংস্থান ঘটিয়ে ডঃ ব্লেক ম্যানেজারিয়াল গ্রীডের ধারণার প্রবর্তন করেন। এর দ্বারা তিনি নূতন কোন তত্ত্বের অবতারণা করেন নি। প্রচলিত ধ্যানধারণার পরিপ্রেক্ষিতে কোন্ ম্যানেজার ব্যক্তিগতভাবে কোন্ ধারণা পোষণ করেন, ম্যানেজারিয়াল গ্রীডের সাহায্যে তা বেশ সুন্দর ও সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়। এই ম্যানেজারিয়াল গ্রীডের বিস্তৃততর আলোচনায় আমরা পরে আসব।

পিটার এফ্ ড্রাকার

পিটার ড্রাকার নিঃসন্দেহে আমাদের শতাব্দীর সর্বাধিক জনপ্রিয় ম্যানেজমেণ্ট উপদেষ্টা। বস্তুতঃ ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের অধ্যয়নে ড্রাকারের বই না পড়ে বা ম্যানেজমেণ্ট ফিল্ম না দেখে পার পাবার কোন উপায় নেই। আইন ও সাংবাদিকতায় যার হাতে খড়ি, নাৎসীবাদের অভ্যুদয়ের সংগে সংগে সে ব্যক্তির প্রথমে লণ্ডন ও পরে নিউইয়র্কে চলে আসা এবং আশ্রয় নেওয়া কোন আশ্চর্য ব্যাপার নয়। কিন্তু শিল্প ব্যবসায়ে উপদেষ্টারূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ এবং শেষ পর্যন্ত সর্বাধিক খ্যাতনামা ম্যানেজমেণ্টবেত্তারূপে পরিণতি লাভ নিশ্চয়ই অত্যন্ত চমকপ্রদ ও অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। বস্তুতঃ ড্রাকারের জীবন, ম্যানেজমেণ্টের যারা জনক অর্থাৎ যাদের চিন্তাভাবনার ফলস্বরূপ ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের উৎপত্তি—তাদের জীবনের মতই অ, আ, ক, খ থেকে শুরু, অর্থাৎ ম্যানেজমেণ্টের পঠন-পাঠন এদের উপজীব্য ছিল না। এরা ব্যবহারিক জগতের লোক এবং কেবলমাত্র পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমেই এরা নূতন নূতন ধ্যানধারণা সমূহের বিকাশ ঘটিয়েছেন। এটা নিশ্চয়ই উল্লেখের অপেক্ষা রাখে যে এতাবৎকালের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও সার্থকতম ম্যানেজমেণ্ট বিশেষজ্ঞের জীবনও ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের পথপ্রদর্শকদের মতই ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের শিক্ষাগত অধ্যয়ন ব্যতিরেকেই শুরু হয়েছিল।

ড্রাকার অসংখ্য বই লিখেছেন এবং ড্রাকারকে নিয়েও অনেক বই লেখা হয়েছে। কিন্তু তাঁর খ্যাতি মূলতঃ *Concept of the Corporation* (১৯৪৬) নামক গ্রন্থের জন্যই। এই পুস্তকে তিনি জেনারেল মোটর কোম্পানীর সংগঠন ও ম্যানেজমেণ্ট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাঁর *Practice of Management* নামক বইটা এখনও বোধহয় বেষ্ট সেলার। গ্রেট বৃটেন ও আমেরিকায় বহু প্রতিষ্ঠান ড্রাকার প্রদর্শিত পথে চলে লাভবান হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ড্রাকার একজন তাত্ত্বিক ম্যানেজমেণ্ট-বিশারদ নন। বরং তাঁর বক্তব্যের প্রকার ও প্রকরণ ব্যবহারিক তথ্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই নির্ধারিত। তাঁর আলোচনার বিষয় জেনারেল মোটরের মত বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠান। কেননা এই ধরনের বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানই আধুনিক শিল্পব্যবস্থার প্রতিভূস্বরূপ ও আদর্শ বলে তিনি মনে করেন। ফলতঃ তাঁর চিন্তাভাবনা, ধ্যানধারণা ও সমস্যা সমাধান পদ্ধতি এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের আদর্শের ভিত্তিতে নির্ধারিত। তাঁর মতে সংগঠন হচ্ছে ব্যবসায়-কর্ম ও ব্যবসায় লক্ষ্যে পৌছানোর হাতিয়ার। ব্যবসায়ের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বা উদ্দেশ্যের আবশ্যিক পরিবর্তন সাধনের জন্যই সংগঠনের প্রয়োজন। সংগঠন পদ্ধতি তিনটি ধারায় এগোয়—কর্মধারা বিশ্লেষণ, ডিসিশন বিশ্লেষণ এবং সম্পর্ক বিশ্লেষণ। বিশেষ বিশেষ কর্মধারা বিশেষ বিশেষ ব্যবসায়ের প্রাণ এবং এই বিশেষ কর্মধারাটাকে খুঁজে বের করে নির্দিষ্ট করে দেখালেই বোঝা যাবে যে কোন্ প্রতিষ্ঠানে কোন্ কাজটা সবচেয়ে জরুরী, কোন্ কাজগুলো পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত, কোন্ কাজগুলো কখন করা উচিত এবং কোন্ কাজে কতটা গুরুত্ব দিতে হবে। ডিসিশন বিশ্লেষণ আলোচনায় ডিসিশনসমূহের প্রকার ও পর্যায়ের ভিত্তিতে সংগঠনের কাঠামো নির্ধারণ করতে হবে। যে কোন ডিসিশন বা সিদ্ধান্তের চারটি বিশেষত্ব রয়েছে—যে ডিসিশন নেওয়া হবে তার ফলে সংগঠনকে কতদিন ব্যস্ত থাকতে হবে, অন্যান্য কাজকর্মের উপর এই সিদ্ধান্তের কি প্রভাব পড়বে, নৈতিক মূল্যবোধ বা রাজনৈতিক ধারণাদির সংগে এই সিদ্ধান্তের কি সম্পর্ক হবে এবং সর্বশেষে এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজনীয়তা এবং উৎপত্তি সময়ের অনুপাতে স্বাভাবিক না কদাচিৎ উদ্ভূত হয়। ড্রাকারের মত অনুযায়ী যে কোন ডিসিশন বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের পিছনে এ ধরনের চুলচেরা বিচার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বিশেষত্বগুলোর

গুরুত্ব ও সন্নিবেশের ভিত্তিতে সংগঠনের ডিসিশন নেওয়ার কাঠামো ও পদ্ধতি তৈরী করতে হবে। পারস্পরিক সম্পর্কের বিশ্লেষণ ও চুলচেরা বিচারও যেকোন সংগঠনের সার্থকতার জন্য আবশ্যক। যে কোন সমস্যা সমাধানে পিটার ড্রাকার বস্তুতঃ কি, কোথায়, কেন, কিভাবে ইত্যাদি সহজ ও আদিম প্রশ্ন-গুলোই আলোচনা করেন এবং অবশেষে আদ্যোপান্ত চুলচেরা বিচার বিশ্লেষণে উপনীত হন। সংগঠনের কাঠামো ও কর্মপদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে ড্রাকারের চিন্তাভাবনা অত্যন্ত ফলপ্রসূ এবং সেজন্যই ব্যবহারিক কর্মক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব-পূর্ণ এবং অনুধাবন যোগ্য।

ম্যানেজমেণ্ট চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের এই যে আলোচনা আমরা করলাম তাতে কয়েকজন ম্যানেজমেণ্ট চিন্তাবিদের কথাই আমরা বলেছি। এই প্রসঙ্গে যে কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে এই যে আমরা যাদের কথা বলেছি তারাই একমাত্র পথিকৃত নন—আরো অনেকে রয়েছেন। আমরা শুধু কয়েকজন প্রধান চিন্তাবিদের কথাই উল্লেখ করেছি। এদের চিন্তা-ধারা আলোচনা করলেই ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের আলোচনা সম্পূর্ণ হয় না—কিন্তু একটা ধারার হিসেব পাওয়া যায়, একটা দৃষ্টিকোণ ধরা পড়ে এবং ম্যানেজমেণ্ট চিন্তার প্রগতির বা ক্রমবিকাশের একটা ছবি ফুটে ওঠে। এরা যে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা করেছেন সেগুলো ছাড়াও আরো অনেক বিষয় ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিস্তৃততর আলোচনার সুযোগ নেই বলেই আরো অনেক চিন্তাবিদের উল্লেখ আমরা করি নি। তবুও একথা যদি বলা যায় যে আমরা যাদের কথা বলেছি তাদের চিন্তা ও ধারণার মাধ্যমে ম্যানেজমেণ্ট চিন্তার প্রধান ধারাটি প্রকাশিত হয় তাহলে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না।

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা যখন ধ্যানধারণা নিয়ে আলোচনা করব তখন কোন ব্যক্তির নাম উল্লেখ আমরা করব না। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেও যে চিন্তাবিদের নাম উঠতে বাধ্য আমরা তাকেও বাদ দেব কেননা আমাদের উদ্দেশ্য মোটেই ইতিহাস আলোচনা নয়। যেমন ধরা যাক Work Study-র কথা বলতে গেলে এর পিতামহ Owen এর কথায় আসা উচিত, কিন্তু আমরা তাকে বাদ দেব। O. R. বা System Analysis-এর কথা বলতে গেলে এই চিন্তাগুলো কোথায়, কি পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত হল, কারা শুরু করলেন, কি

করে এগুলো আরো বিকাশ লাভ করল—এই সমস্ত ঐতিহাসিক পুংখানুপুংখ বিচারেও আমরা প্রবৃত্ত হব না। আমাদের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র ধারণা বা চিন্তা-টিকেই একটু পরিষ্কার করে তুলে ধরা। এই ক'টি কথা মনে রেখে ম্যানেজমেণ্ট চিন্তার ক্রমবিকাশের আলোচনা শেষে আমরা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এগিয়ে যাব।

॥ ৪ ॥

মানুষের কাজকর্ম ও স্ব-প্রণোদনা (Motivation)

উৎপাদনশীলতার আলোচনা প্রসংগে আমরা আগেই দেখেছি যে কম খরচে বেশী উৎপাদন পাওয়ার নামই উৎপাদনশীলতা এবং উপাদানসমূহের উপযোগ বাড়িয়ে বা অপচয় কমিয়েই উৎপাদন ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বেশী উৎপাদনশীল করে তোলা যায়। মানুষই উৎপাদন করে। টাকাকড়ি, ঘরবাড়ী, মেশিনপত্র, কর্মপদ্ধতি ইত্যাদি সবকিছুই নিরর্থক হবে যদি তাতে মানুষের কায়িক ও মানসিক শ্রম উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিযুক্ত না হয়। মানুষের শ্রম সর্বাধিক পরিমাণে ও সর্বোত্তমভাবে নিযুক্ত হলেই উৎপাদন সবচেয়ে বেশী পরিমাণে ঘটতে পারে। অতএব মানুষী শ্রমই উৎপাদনশীলতার প্রাণ। মানুষ আরো বেশী কাজ করবে এবং ম্যানেজার সর্বোত্তমভাবে সেই কাজ আদায় করবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী তার বিনিয়োগ করবে—এই হচ্ছে ম্যানেজারের আদর্শ।

কিন্তু মানুষ কেন কাজ করে? মানুষ যে কাজ করে সে কাজ কোন্ পর্যায়ে পৌঁছুলে তাকে সর্বোত্তম বলা যায়? মানুষের কাছ থেকে সর্বোত্তম ও সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করার পন্থা-পদ্ধতি কি? এই প্রশ্নগুলো খুব সরল শোনালেও আসলে এগুলো অত্যন্ত জটিল। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে এই প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব অনেকখানি। বস্তুতঃ এই প্রশ্নগুলোর বিজ্ঞানসম্মত উত্তর খোঁজাই ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রের প্রধান কাজ। মানুষ যদি যন্ত্র হ'ত তাহলে কোন সমস্যা ছিল না। এমনকি মনুষ্যেতর প্রাণী হলেও তেমন কোন সমস্যা ছিল না। কিন্তু গোলমাল বাধায় মানুষের মন এবং তার বুদ্ধি। এই দুটো ব্যাপারেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে ভিন্ন, উন্নত এবং জটিল। যন্ত্র হলে জ্বালানীর পরিমাণ কমিয়ে বাড়িয়ে কম বেশী কাজ আদায় করা যেত, মনুষ্যেতর প্রাণী হলে স্বাভাবিক নিয়মসিদ্ধ গতানুগতিকতায় (ঘোড়া, কুকুর, গরু ইত্যাদির মত) কাজ আদায় করা যেত। কিন্তু কাজ যারা আদায় করবে সেই ম্যানেজার ও যারা কাজকর্ম ঠিকভাবে করবে সেই সাধারণ শ্রমিক—উভয়েই যেহেতু একই গ্রহের মানুষ, একই অস্থিমজ্জায় গঠিত মানুষ, সেজন্য মানুষ, তার মন, বুদ্ধি, শরীর ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার না হলে

সর্বোত্তম কাজ পাওয়া যাবে না। মধ্যযুগে আফ্রিকার মানুষগুলোকে নিয়ে যখন দাস-ব্যবসায় চালান হত তখন সাদা চামড়ার চাবুকের ভয়ে কালো চামড়ারা কাজ করত। কালো চামড়াদের মানুষের মত দেখতে এক ধরণের প্রাণী মনে করা হত, অন্তত: সাদা চামড়ারা নিজেদের চেয়ে ওদের যে নিকৃষ্টতর মনে করত সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কিন্তু তাতেও কি ওরা সর্বোত্তম কাজ পেয়েছে? শুধু মাত্র ভয় দেখিয়ে বা দানা-পাণি দিয়ে মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ কোনমতেই করা যায় নি এবং কোনদিনও যাবে না। আজকের দিনে জাতি, ধর্ম, স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে মানুষের সমান অধিকারের দিনে চাবুক আর লাঠির জোর চালাবার কোন সুযোগ নেই। তাই মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী ও ভালো কাজকর্ম আদায় করার অন্য পদ্ধতি খুঁজে বের করাই হচ্ছে বর্তমানে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রধান কাজ। যে পথটি খুঁজে বের করতে হবে তা যে শুধু মানবতা-বোধ সম্পন্ন হবে তাই নয়, একে বিজ্ঞানসম্মতও হতে হবে। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান তাই সংগত কারণেই মানুষ সম্পর্কিত যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের খোঁজ নেয় যাতে একটা সর্ববাদীসম্মত তত্ত্ব গড়ে তোলা যায়। মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, অর্থবিদ্যা, শরীরবিদ্যা ইত্যাদি সর্বপ্রকার মানুষ ও মানুষের কার্য্যাবলী সংক্রান্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের সংগে এ ব্যাপারে হাত মেলায়। বিভিন্ন শাস্ত্র তার নিজস্ব দৃষ্টিকোণে মানুষ ও মানুষের মন, বুদ্ধি তথা কার্যাবলী সম্পর্কে যে সমস্ত সিদ্ধান্তে পৌছোয়, ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান তারই ভিত্তিতে মানুষের কাজ-কর্ম সম্বন্ধে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে পৌছবার চেষ্টা করছে। যদিও এ ব্যাপারে শেষ কথা বলা হয়ে গেছে এমন দাবী করা যায় না, তবুও বিশ্বের তাবৎ পণ্ডিতবর্গ মনে করেন যে মানুষ তখনি কোন কাজে আপন সামর্থ্য পুরোপুরি ঢালে যখন সে ঐ কাজে সম্পূর্ণ একাত্ম বা উদ্বুদ্ধ হয়। এই উদ্বুদ্ধতাকেই স্ব-প্রণোদনা বা মোটিভেশন্ বলা হয়েছে। অর্থাৎ মোটিভেটেড বা স্বেচ্ছা-প্রণোদিত মানুষই হচ্ছে আদর্শ কর্মী এবং তাই সমস্ত শ্রমিক-কর্মচারীকে মোটিভেটেড করে তোলাই হচ্ছে ম্যানেজারের প্রধান কর্ম।

আমরা আগেই বলেছি যে মানুষ যদি যন্ত্র হ'ত তাহলে জ্বালানীর পরিমাণ বাড়িয়ে কমিয়ে মানুষের উৎপাদন-কর্মের তারতম্য ঘটানো যেত। মানুষের জ্বালানী হচ্ছে অন্ন-বস্ত্র-খাদ্য। একেবারে মৌলিক এই চাহিদাগুলোর নিবৃত্তি

না হলে কাজকর্ম তো দূরের কথা মানুষের অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু এগুলো মেটালেই কি সবকিছু হয়ে যায়? টাকাই যেহেতু সবকিছু মাপার একক অর্থাৎ যেহেতু অন্ন-বস্ত্র-খাদ্যের যোগাড় টাকার মাধ্যমেই করা যায়, সেহেতু টাকাপয়সা অর্থাৎ আর্থিক মজুরী বাড়ালেই তো হয়। আর্থিক মজুরী বাড়লে উৎপাদন বাড়বে, আর্থিক মজুরী কমলে উৎপাদন কমবে। আর্থিক মজুরীর হ্রাসবৃদ্ধির সংগে উৎপাদনের হ্রাসবৃদ্ধির এই যে সম্পর্ক, বহুকাল ধরে এই সম্পর্ক সম্বন্ধে কিছু ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল ছিল। এই ধারণাগুলোই মানুষের ম্যানেজমেণ্ট চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করত। 'হদর্ন পরীক্ষা', যার কথা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি, এই বদ্ধমূল ধারণাসমূহকে প্রথম প্রচণ্ড আঘাত হানলো। এরই ফল হিসেবে মানুষের কাজকর্মের আসল চাবিকাঠিটি খুঁজে বের করার চেষ্টা শুরু হল। মানুষের মনোপ্রাণ ঢালা কাজকর্ম কখন পাওয়া যায়, কিভাবে পাওয়া যায় এই নিয়ে গবেষণা ও আলোচনার সূত্রপাত তখন থেকেই হল। কালক্রমে বহুবিধ তত্ত্বের জন্ম হল, বহু পণ্ডিত বিশেষজ্ঞ বহু ধরণের কথা বললেন এবং এখনও বলে চলেছেন। কিন্তু মোদ্দা যে কথাটা বোঝা গেল তা হচ্ছে এই যে, স্ব-প্রণোদনা বা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতাই হচ্ছে আসল জিনিস—এই ব্যাপারটা যদি নিশ্চিত করা যায় তাহলেই মানুষের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করা সম্ভব, অন্যথা নয়। এ ব্যাপারে মোটামুটি সকলেই একমত। কিন্তু যে ব্যাপারে মতামতের ভিন্নতা দেখা যায় তা প্রধানতঃ পন্থা-পদ্ধতি সম্পর্কিত। অর্থাৎ স্ব-প্রণোদনা কিভাবে বাস্তবে সার্থকভাবে সম্ভব করে তোলা যায় তার উপায় সম্বন্ধে অনেক মতামত রয়েছে। কিন্তু এই মতামত পর্য্যালোচনার আগে 'স্ব-প্রণোদনা' ব্যাপারটা কি সেটাই দেখা দরকার।

স্ব-প্রণোদনা বা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতা এই কথাটার মধ্যেই এর অর্থ লুকিয়ে আছে। কাজ করার যে প্রেরণা সেটা যদি স্বয়ং সাধিত হয় অর্থাৎ বাইরে থেকে কারুর কোন অনুপ্রেরণা বা অনুশাসন ছাড়াই যদি ব্যক্তি উদ্দীপিত হয়ে ওঠে তবেই আমরা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতার কথা বলতে পারি। ইংরেজীতে একেই বলা হয়েছে মোটিভেশন্। ব্যাটারীকে বারবার চার্জ করতে হয়, ব্যাটারীর শক্তি ধার করা—এজন্য একে accumulatorও বলা হয়। অর্থাৎ ব্যাটারী বৈদ্যুতিক শক্তি তৈরী করে না, জমা করে রাখে। কিন্তু জেনারেটর বৈদ্যুতিক

শক্তি তৈরী করে—জল, কয়লা বা গ্যাস যা কিছুই হোকনা কেন, চাকা ঘোরাবার মত একটা ব্যবস্থা থাকলেই হ'ল, জেনারেটর ক্রমাগত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে যাবে। স্ব-প্রণোদিত মানুষকে জেনারেটারের সংগে তুলনা করা যেতে পারে। স্ব-প্রণোদিত মানুষ আপন ছন্দে কাজ করে চলে—তাকে বাইরে থেকে গুতোতে হয় না। সে কাজের জন্যই কাজ করে এবং যেহেতু সে মনোপ্রাণ ঢেলে কাজ করে সেহেতু সেই কাজ সম্বন্ধে কোন অনুযোগ অভিযোগ করার থাকে না। গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে এই কাজ যে সর্বোত্তম ও আদর্শ-স্বরূপ হবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতেপারে যে এখানে একটা বৈপরীত্য বা contradiction রয়েছে। যে কাজ স্বেচ্ছায় এবং আপন প্রেরণায় সম্ভব হয় সেখানে ম্যানেজারের অনুপ্রেরণার কি প্রয়োজন? আর ম্যানেজারকে যদি বাইরে থেকে লাঠির ভয় বা পুরস্কারের লোভ দেখাতে হয় তাহলে স্ব-প্রেরণা কথাটার কি কোন অর্থ থাকে? বাইরের প্রভাব ছাড়া যদি মানুষ অনুপ্রাণিত না হয় তাহলে 'স্ব' কথাটা কেটে দেওয়াই উচিত। অর্থাৎ নিজেই নিজের থেকে উদ্বুদ্ধ না হলে স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতা বা স্ব-প্রণোদনা কথাদুটোর কোন মানে থাকে না। প্রকৃতপক্ষে এখানে কিন্তু কোন কণ্ট্রাডিক্সন বা বৈপরীত্য নেই। কোনো কাজে মানুষ স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধ তথা স্ব-প্রণোদিত কেন হয় এ প্রশ্নটার উত্তর হয়তো সেই কাজটির বৈশিষ্ট্য বা সংগঠন-পরিবেশের মধ্যেই নিহিত আছে। ম্যানেজারের পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে কোন ব্যক্তিকে গুতোবার বা লোভ দেখাবার দরকার নেই কিন্তু তাকে অবশ্যই গড়ে তুলতে হবে সেই আবহ বা কর্মপরিমণ্ডল যেখানে মানুষ আপনা আপনিই নিজস্ব সকল সামর্থ্য কর্ম সম্পাদনে ঢেলে দেয়। যে কাজটি করাতে হবে সেই কাজটি সম্পাদনে ব্যক্তি কতটা তৃপ্তি বা আনন্দ পাবে সেটাও হয়তো ম্যানেজারকে বিবেচনা করতে হবে। ম্যানেজার সরাসরি প্রভাব বিস্তার না করলেও তাকে প্রচ্ছন্নভাবে প্রভাব বিস্তারে অবশ্যই সচেষ্ট থাকতে হবে। কিন্তু তা করতে গেলে তার আগে ম্যানেজারকে অবশ্যই জেনে নিতে হবে স্ব-প্রণোদনা কি, এর প্রকার প্রকরণ কি, এ ব্যাপারটা কি কি উপাদানের উপর নির্ভর করে ইত্যাদি। এতএব সর্বপ্রথমেই দেখা যাক স্ব-প্রণোদনা তথা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতার প্রকার-প্রকরণ তথা উপাদানসমূহ কি কি?

মানুষ কাজ করে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে কাজ করে যেতে হয়।

দেখে মনে হয় যেন কাজের জন্যই মানুষের জন্ম। কিন্তু মানুষ কেন কাজ করে? প্রাথমিকভাবে অবশ্যই বলা চলে যে খেয়ে পরে বাঁচার জন্যই মানুষ কাজ করে। কিন্তু যার খেয়ে বাঁচার জন্য অর্থাৎ পয়সার জন্য চাকুরীর দরকার নেই—সে কেন কাজ করে? অন্যান্য কারণ থাকতে পারে—যেমন সময় কাটানো, রুচির পরাকাষ্ঠা দেখানো বা অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হওয়া। অতএব দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কারণের বশবর্তী হয়েই মানুষ কর্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু অন্যাবধি অধীত ও পরম্পরাগত ভাবে প্রাপ্ত জ্ঞান ও তত্ত্বসমূহের পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে মানুষের আচরণ বা behaviour সম্বন্ধে এ ধারণাই বর্তমান যে, মানুষ কাজকর্ম ভালোবাসে না অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ স্বভাবগতভাবে কাজকর্মে অনিচ্ছুক। ফলতঃ এই অনিচ্ছুক ব্যক্তিকে কাজকর্মে নিযুক্ত করতে হ'লে, ছলে-বলে-কৌশলেই বাধ্য করতে হয়। Carrot and stick পলিসিই হচ্ছে আসল কথা। অর্থাৎ একহাতে ছোলার বস্তা অন্য হাতে ছড়ি নিয়ে কথা-মালার গাধাকে দিয়ে দৌড় করানোর মত মানুষকে দিয়ে কাজ করাতে হবে। সাধারণভাবে বেশীর ভাগ মানুষেরই কোন উচ্চাকাংখা নেই। এরা দায়িত্ব নিতে ভয় পায়। টাকা-পয়সা ছাড়া এরা অন্য কিছু বোঝে না। যত বেশী অর্থ উপার্জন করা যায় ততই এরা খুশী হয়। এরা আসলে অলস ও অকর্মণ্য। এরা শক্তের ভক্ত অর্থাৎ সংগঠন ও ম্যানেজার যদি কড়া হয় তবেই কেবল অধীনস্থ লোকজনকে দিয়ে কাজ করাতে পারে। আর ম্যানেজার যদি নরম হয় তাহলে কাজকর্ম গোল্লায় যায়, শ্রমিক-কর্মচারী লায় পেয়ে মাথায় চড়ে বসে। ভালোভাবে কাজ করলে শ্রমিক-কর্মচারীকে পুরস্কৃত করতে হবে কিন্তু শুধু মাত্র পুরস্কারের লোভই যথেষ্ট নয়। বেশীর ভাগ সময়ই লাঠি দিয়ে গুতোতে হবে। ভয় দেখানো ও শাস্তিপ্রদান করা এ দুটোই হচ্ছে প্রধান কারণ যার জন্য মানুষ কাজ করে।

এই যে ধারণাগুলো, যে গুলোকে সাধারণ মানুষের আচরণবিধির স্তম্ভ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে, এগুলোকে এক সাথে 'থিয়োরী X' বলা হয়েছে। বস্তুতঃ এই ধারণাগুলো এতাবৎ কালের কর্মপ্রবাহ থেকেই উদ্ভূত হওয়ায় এক দিকে যেমন এগুলোর সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, তেমনি অন্যদিকে এই ধারণাগুলোকে যখন ব্যবহারিক জগতে কিছু কিছু বাস্তবিক দেখা যায় তখন আরোই কোনো সন্দেহ উদ্রেকের অবকাশ থাকে না। ফলতঃ

এ তত্ত্বকে প্রচলিত জ্ঞান (conventional wisdom) আপ্ত ও ধ্রুব সত্য বলে মনে করে এবং সেজন্যই মানুষের আচরণ যে অন্য কোন রকমের হতে পারে তাতে আদৌ বিশ্বাস করে না।

কিন্তু গোল বাধালো সেই 'হদর্ন পরীক্ষা' যার উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। আর্থিক মজুরীই মানুষের কাজকর্মের একমাত্র নিয়ামক নয় এবং তাই মানুষের কাজকর্মের আসল কারণ অন্যত্র খুঁজতে হবে। মনোবিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ্, ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানী ইত্যাদি সকলে মিলে তথ্য অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হলেন। ম্যাস্‌লো 'তৃপ্তির সিঁড়ি ভাঙার' সংগে স্ব-উদ্‌বুদ্ধতার সমীকরণ ঘটালেন। একে একে অনেক কিছু জানা গেল। নূতন জ্ঞানের আলোয় পুরানো অনেক ধ্যানধারণা পাল্টে গেল। থিয়োরী X এর সিদ্ধান্তসমূহকে নস্যাৎ করে দিয়ে যে নূতন ধারণাসমূহ গজিয়ে উঠল একসাথে এরই নাম দেওয়া হয়েছে 'থিয়োরী Y'। সংক্ষেপে বলতে গেলে এই ধারণাসমূহ হচ্ছে এইরূপ : মানুষ মোটেই স্বভাবতঃ শ্রমবিমুখ নয়। কর্মে মানুষের কোন কায়িক বা মানসিক অনীহা বা অনিচ্ছা নেই কেননা কাজকর্মে যে শারীরিক বা মানসিক শ্রম আমরা ব্যয় করি তা প্রকৃতপক্ষে খেলাধূলায় যে শ্রম আমরা দিই তার চেয়ে বেশী নয়। কাজকর্ম যেমন তৃপ্তি বা আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে তেমনি কষ্ট ও নিরানন্দও সৃষ্টি করতে পারে। যে কাজে তৃপ্তি পাওয়া যায় সে কাজ করতে গেলে বাইরে থেকে কোন গুতোর দরকার হয় না। কিন্তু যে কাজ ভাল লাগে না সেই কাজ করতে গেলে বাইরে থেকে তাড়ার দরকার। মানুষ যদি বুঝতে পারে যে সংগঠনের উদ্দেশ্যসাধনে তার ব্যক্তিক উদ্দেশ্যও সাধিত হবে তাহলে যত অপ্রীতিকর কাজই হোক না কেন, সেই কাজ ব্যক্তি মানুষ নিজে নিজেই সম্পন্ন করবে। কিন্তু তার এই নিজস্ব ব্যক্তিক উদ্দেশ্য সাধন অর্থ উপার্জন বা চাকুরীর নিরাপত্তা সন্ধান করার জন্য নয়—এ হচ্ছে এক ধরনের মানসিক তৃপ্তি যা চরিতার্থতা বা অ্যাচিভ্‌মেণ্টের অনুভূতি জাগায়, আত্মতৃপ্তি তথা আত্মউপলব্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। সংগঠনের উদ্দেশ্যসাধনে ব্যক্তিমানুষ তখনি committed বা স্ব-প্রবৃত্ত হবে যখন সে সংগঠনের উদ্দেশ্যসাধন দ্বারা নিজের আত্মতৃপ্তি তথা চরিতার্থতা লাভ করবে। মানুষ স্বাভাবিকভাবে আমৃত্যু শিক্ষালাভ করতে করতেই চলে। অর্থাৎ যতদিন বাঁচে ততদিনই শেখে।

এই শেখার প্রেরণা মানুষকে যে শুধু দায়িত্বভার নিতে শেখায় তাই নয়, দায়িত্বভার নিতে শেখায় ও উদ্বুদ্ধ করে। কাজকর্মের নৈরাশ্যজনক ও নেতিবাচক অবস্থাই মানুষকে হতাশার দিকে ঠেলে দেয়। তাই উচ্চাকাংখাহীনতা তথা দায়িত্বগ্রহণে পরাঙ্মুখতা—বাস্তবে যেগুলো আমরা প্রায়ই দেখি এগুলো আসলে ব্যক্তিমানুষের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ তাদের কাজকর্মের হতাশা ব্যঞ্জক পরিস্থিতিই তাদের এদিকে ঠেলে দিয়েছে। মানুষের মূলগত বৈশিষ্ট্য মোটেই মানুষকে উদ্যমহীনতা বা উচ্চাকাংখাহীনতার দিকে চালিত করে না। এগুলো সংগঠনের ভ্রান্ত কর্মধারার ফল ছাড়া অন্য কিছু নয়। ব্যক্তি মানুষ এই ভ্রান্ত কর্মধারার যাঁতাকলে পড়ে নিষ্পেষিত হয়ে যায় এবং নৈরাশ্যের বশবর্তী হয়ে কর্মবিমুখ, উদ্যমহীন তথা অলস হয়ে পড়ে। অথচ বেশীরভাগ মানুষেরই potentiality বা স্বাভাবিক ক্ষমতা অপরিসীম। নিতান্ত সাধারণ শিক্ষিত মানুষও কম imaginative (কল্পনাশীল) বা কম creative (ক্রীয়েটিভ) নয়। কিন্তু অপরিণামদর্শী, ভ্রান্ত কর্ম-আবহে পড়ে এদের স্বাভাবিক গুণাবলীর বিকাশ রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে সংগঠন ও ব্যক্তি মানুষের অপর্যাপ্ত ক্ষমতা, দক্ষতা তথা বুদ্ধিমত্তার সার্বিক প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়। মানুষ যেমন একদিকে নিজেকে পুরোপুরি বিকশিত করে তুলতে পারে না—সংগঠনও তেমনি মানুষের সর্বোত্তম কর্মপ্রয়াস থেকে বঞ্চিত হয়। ফলতঃ ব্যক্তি, সংগঠন, সমাজ সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

অতএব দেখা যায় যে থিয়োরী X যদি এক প্রান্ত হয় তাহলে থিয়োরী Y তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। একটু বিস্তৃত পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে থিয়োরী X যেগুলোকে মানুষের স্বাভাবিক আচরণ বলে, থিয়োরী Y সেগুলোকে সংগঠনের ভ্রান্ত কর্মধারার ফল বলেই মনে করে, থিয়োরী Y অনুসারে থিয়োরী X মানুষের আচরণবিধির কোন ব্যাখ্যাই করে না, মানুষের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যের কোন পরিচয়ই প্রদান করে না। কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে কিছু ভুল পলিসি নেওয়ার ফলে মানুষের স্বাভাবিক গুণাবলী কিভাবে রুদ্ধ হয়ে যায়, থিয়োরী X শুধু তারই আলোচনা করে।

বেশীরভাগ মানুষই প্রধানতঃ অর্থের প্রয়োজনে কাজকর্ম, যথা—চাকরীবাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজকর্ম করে থাকে। কেননা নিতান্ত জৈব প্রয়োজন অর্থাৎ অন্ন-বস্ত্রের যোগাড়ের জন্য অর্থ অপরিহার্য। অর্থপ্রাপ্তি

নিশ্চিত হলে মানুষ চায় নিরাপত্তা। এই নিরাপত্তাবোধও অবশ্য অনেকাংশে জৈবিক কারণেই। চাকুরীর বা ধনমানের নিরাপত্তা স্থিরীকৃত হয়ে গেলে, অর্থাৎ চাকুরীর থাকা না থাকা বা অর্জিত ধনসম্পদের ভোগ এবং সঞ্চয় করতে পারা বা না পারা কারুর ব্যক্তিগত খেয়ালখুশীর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে সুনিশ্চিত কার্যকারণের ওপর নির্ভরশীল হলে মানুষের প্রয়োজন অর্থ ও নিরাপত্তার উর্দ্ধে অন্য কিছুর অনুসন্ধান করে। মানুষের জৈবিক চাহিদা ও এষণা এখন আর অনিশ্চিত থাকে না। এখন মানুষ চায় কতকগুলো মানসিক প্রয়োজনের পরিতৃপ্তি। সে চায় সামাজিক প্রীতি-ভালোবাসা তথা স্বীকৃতি। কিন্তু একবার এগুলো অধিগম্য হয়ে গেলে, সামাজিক দায়িত্ব-কর্তব্যের শৃঙ্খলে আপন ষ্ট্যাটাস্ সুনির্ধারিত তথা সুনিশ্চিত হয়ে গেলে মানুষের প্রয়োজন আরো উর্দ্ধে পাখা মেলে। তখন সে চায় আত্ম-অনুভব তথা আত্ম-উপলব্ধির পরিতৃপ্তি। অর্থের এষণা থেকে আত্মোপলব্ধির তুঙ্গশীর্ষে এই যে উত্তরণ—সকল মানুষই এর চেষ্টা করে। সবাই যে চরমে পৌঁছোয় তা যেমন ঠিক নয়, তেমনি সকলেই যে এই উত্তরণের সিঁড়িতে কোথাও না কোথাও দাঁড়িয়ে নেই একথাও ঠিক নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই এই প্রয়োজনের সিঁড়িপথে কোথাও না কোথাও অবস্থিত। সংগঠনের দায়িত্ব শুধু যে ব্যক্তির এই প্রয়োজনের পর্য্যায়কে অনুধাবন করা তা নয়, তদনুযায়ী ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির সংগে সাংগঠনিক উদ্দেশ্যসাধনের সমন্বয় গড়ে তোলাও সংগঠনের কর্তব্য।

যদি তা না করা যায়, যদি এই সমন্বয় সাধন না করা যায়, তাহলে কি হবে? থিয়োরী X মানুষের আচরণবিধির যে ব্যাখ্যা করে তাই হবে। মানুষ একেবারে উদ্যমহীন হয়ে পড়বে, কাজকর্মে মন ঢালা দূরে থাক, ফাঁকিবাজীটাই আসল হয়ে পড়বে। ফলতঃ মানুষকে দিয়ে কাজ করাতে হলে ক্রমাগত গুতোতে হবে। খাদ্যাভাবজনিত অপুষ্টি যেমন জীবের রোগসৃষ্টি করে তেমনি মানবিক প্রয়োজন ও চাহিদাসমূহের অপূর্ণতাও একধরণের অসুস্থতারই সৃষ্টি করে। ফলতঃ মানুষ যে কাজ করতে চায় না, দায়িত্বগ্রহণে পরাঙ্মুখ হয়—এগুলোর জন্য দায়ী সংগঠন, ব্যক্তি নিজে নয়। মানুষ বা যে কোন জীবজন্তুরই বাঁচার জন্য একটা নির্দিষ্ট পরিবেশ অর্থাৎ জল-বায়ু-আর্দ্রতার দরকার—এর অভাবে মানুষ বা যে কোন জীব সুস্থ থাকতে পারে না। কম জলের মাছ বেশী জলে বাঁচে না। পুকুরের মাছ সমুদ্রে বাড়ে না। অত্যধিক ঠাণ্ডায়

কোন লোককে রাখলে যদি তার নিউমোনিয়া বা ব্রঙ্কাইটিস্ হয়—সেটা কি তার দোষ? ঠিক তেমনি মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের প্রতিকূল ব্যবস্থাসমূহ অবলম্বন করলে মানুষের স্বভাব যদি বিগড়ে যায় তবে কি সেটা মানুষের নিজের দোষ?

অতএব সংগঠনের কর্মপদ্ধতি এমনভাবে সুসংবদ্ধ করতে হবে যাতে সংগঠনাধীন ব্যক্তিবর্গ তাদের প্রয়োজন তথা উদ্দেশ্য সংগঠনের উদ্দেশ্যসাধনের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। শুধুমাত্র লাঠির জোরে অর্থাৎ কর্তৃত্ব বা নির্দেশের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সংগঠনের উদ্দেশ্যের সংযোগ সাধিত হতে পারে না। এর জন্যে চাই একটা সমন্বয়ী প্রচেষ্টা—যেটা সাধারণভাবে বর্তমান সাংগঠনিক ব্যবস্থায় অনুপস্থিত। যখনি কোন ব্যক্তি কোন সংগঠনে কর্মগ্রহণ করে তখনি ধরে নেওয়া হয় যে অর্থ এবং অন্যান্য সুবিধে-শর্তাদির বিনিময়ে সেই ব্যক্তি সংগঠনের নির্দেশে কাজ করে যাবে। এছাড়া অন্য কোন পন্থা পদ্ধতি যে থাকতে পারে, ব্যক্তিকে সংগঠনের সমানুবর্তী করতে গেলে যে অন্য কোন উপায় থাকতে পারে সেটা কারুর মাথায়ই আসে না। এ যেন এ্যাল্‌সেশিয়ান কুকুর পোষা—খাবে, দাবে, যত্ন-আত্তি পাবে, কিন্তু প্রভুর নির্দেশ মেনে চলতে হবে। বস্তুতঃ এজন্যই ক্রীস্ আর্‌গীরিস্ যখন বলেন যে নিয়ন্ত্রণ-নির্দেশের এই যে বর্তমানে প্রচলিত সাংগঠনিক ব্যবস্থা ও কর্মপদ্ধতি তা শুধুমাত্র শিশুদের জন্য ও তাদেরই উপযুক্ত, কোন পূর্ণ মানুষের জন্য নয়, তখন বোধহয় তিনি খুব একটা বাড়িয়ে বলেন না। 'প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ' এই আপ্তবাক্য বহুকাল ধরে প্রচলিত। এর অর্থ হচ্ছে এই যে ষোল বছর বয়স হয়ে গেলে নিজের ছেলের সংগেও শিশুসুলভ আচরণ না করে তাকে প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা দেওয়া উচিত। অর্থাৎ শিশুর ক্রমশঃ বয়সবৃদ্ধির সংগে সংগে পৈতৃক কর্তৃত্বের ধারাও ক্রমহ্রাসমান গতিতে নিম্নাভিমুখী হতে হতে অবশেষে মিত্রসুলভ হওয়া উচিত। অথচ প্রতিষ্ঠান সর্বস্ব সংগঠন যেখানে বহু ব্যক্তি জড়িত সেখানে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়। এটা বোঝা উচিত যে নির্দেশের বোঝা চাপিয়ে কাজ চালানো যায় বটে কিন্তু ব্যক্তির পূর্ণব্যক্তিত্বের বিকাশ তো অনেক দূরের কথা—ব্যক্তির সংগে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য ও কর্মধারার কোন ঐক্য, সামঞ্জস্য বা সহযোগিতাই সম্ভব নয়।

গোঁড়া তাত্ত্বিকেরা নাক কুচকে প্রশ্ন তুলবেন—তাহলে কি নিয়ন্ত্রণ-নির্দেশের কোন মূল্যই নেই? সংগঠনের কর্মব্যবস্থা থেকে নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশের সমস্ত ধারা প্রধারা তুলে দিয়ে ম্যানেজমেণ্ট ব্যবস্থাকে কি সম্পূর্ণ soft বা নমনীয় করে তুলতে হবে? আরেকটু গলাটা চড়া করে তারা বলবেন, তাহলে ম্যানেজারের দরকার কি, ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানেরই বা দরকার কি, ব্যক্তিকেই সর্বেসর্বা করে তুললে হয়—যে যা খুশী করুক, ফাঁকি দিয়ে কোম্পানীকে লাটে তুলুক, শ্রমিক-কর্মচারীরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে ম্যানেজমেণ্টের পরাকাষ্ঠা দেখাক। থিয়োরী Y কিন্তু কখনও বলছে না যে সমস্ত নিয়ন্ত্রণ উঠে যাক, যে যা খুশী করুক, কোম্পানী লাটে উঠুক। থিয়োরী Y ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশকে বড় করে দেখছে এজন্য যে ব্যক্তিত্বের পূর্ণতর বিকাশের মধ্যেই আছে সাংগঠনিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির সর্বোত্তম প্রতিশ্রুতি। কিন্তু তা শুধু কর্তৃত্ব ফলালেই বাস্তবায়িত হবে না, তার জন্য চাই সমন্বয়ী প্রচেষ্টা। এ প্রচেষ্টা যত যথাযথ হবে ততই মানুষ স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হয়ে সংগঠনের কর্মধারায় নিজেকে উৎসর্গ করবে। থিয়োরী Y তাই ম্যানেজারদের উদ্দেশে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে নতুন ভাবে ভাববার জন্য, নতুন ভাবে কর্ম পদ্ধতি স্থির করার জন্য, নতুন ধরণের চিন্তা ও অ্যাটিচ্যুড্ নিয়ে কাজে নামবার জন্য।

বস্তুতঃ এই নতুন ধারণাসমূহই যে মানবচরিত্র তথা আচরণ বিধির শেষ কথা তা নয়। কিন্তু এই ধারণাসমূহের অবলম্বনে কর্ম-পদ্ধতি অনুসৃত হলে হয়তো আরো নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মুক্ত হবে এবং ব্যক্তি ও তার আচরণ, তার মনোবৃত্তি, বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে তার মানসিক বিবর্তন ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান আরো বর্ধিত হবে। তবে একথা নিশ্চিত করে অবশ্যই বলা যায় যে অদ্যাবধি অর্জিতজ্ঞানের ভিত্তিতে এই ধারণাসমূহই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের আধুনিকতম অবদান এবং সেজন্য কালের সংগে তাল মিলিয়ে চলতে হলে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রগতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত করতে হলে, এই ধারণাসমূহের উপর ভিত্তি করেই ম্যানেজারকে কাজকর্ম চালিয়ে যেতে হবে।

একথা না হয় বোঝা গেল এবং মেনে নেওয়াও গেল যে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত মানুষই আসল কাজের কাজী। পুরোনো বস্তা-পচা ধারণাগুলোকে থিয়োরী X নাম দিয়ে না হয় নির্বাসিত করা হল। নতুন নতুন ধারণা ও আইডিয়া

যেগুলো আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার অবদান সেগুলোকে থিয়োরী Y নামক আধুনিক ছাতার তলায় জড়ো করে না হয় ম্যানেজারকে দেওয়া হল। কিন্তু বেড়ালের গলায় ঘণ্টা কি করে বাঁধা হবে? মোটিভেশন মোটিভেশন বলে চেঁচালেই তো হবে না, কি করে এই স্ব-উদ্বুদ্ধতা বা মোটিভেশন বাস্তবে সম্ভব করে তোলা যায় সেটাই দেখতে হবে। How to motivate—পরবর্তী অধ্যায়ে আসুন আমরা এই আলোচনায়ই এগিয়ে যাই।

॥ ৫ ॥

স্ব-প্রণোদনা সাধনের উপায় (How to motivate ?)

মানুষের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ আদায় করাই ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের লক্ষ্য। স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধ ব্যক্তির কাছ থেকেই সবচেয়ে বেশী ও সবচেয়ে ভাল কাজ পাওয়া যায়। কেন অর্থাৎ কি কি কারণে মানুষ নিজেই উদ্বুদ্ধ হয়, কি করে মানুষকে স্বেচ্ছা উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়—এখন এই প্রশ্নটাই আলোচনা করতে হবে।

মানুষকে কি করে মোটিভেট্ বা উদ্বুদ্ধ করা যায় এই নিয়ে আলোচনা, গবেষণা তথা অনুশীলন বেশ অনেকদিন ধরে চলে আসছে! বহু পণ্ডিত এই নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন এবং এখনো ঘামিয়ে চলেছেন। এই নিয়ে বহু এক্সপেরিমেণ্ট হয়েছে, বহু রকমের পন্থা পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে।

প্রথমেই মনে করা হল যে কাজকর্মের যারা সংগঠক ও পরিচালক সেই ম্যানেজারদের মনোবৃত্তি বা অ্যাটিচ্যুড-এর পরিবর্তন দরকার। থিয়োরী X-এর বস্তাপচা ধ্যান-ধারণায় লালিত-পালিত ম্যানেজারদের মাথায় নতুন ধ্যান-ধারণা কিছুতেই ঢুকবে না এবং যদিও বা ঢোকে পুরোপুরি ফলপ্রসূ তথা কার্যকরী হবে না যদি না ম্যানেজারের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা যায়। কিভাবে এই মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা যায়? কিভাবে ম্যানেজারদের নতুন ধ্যান-ধারণা উপলব্ধি করা এবং তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করার পক্ষে আবশ্যিক মানসিক যোগ্যতার অধিকারী করে তোলা যায়? আচরণবেত্তাগণ (Behavioural Scientists) Human Relations Training বা মানবিক সম্পর্কের এক ট্রেনিংয়ের বিধি দিলেন। সমাজ বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি থেকে সংগৃহীত তথ্য ও তত্ত্বাদির সাহায্যে এক ট্রেনিংয়ের কার্যক্রম তৈরী হল। সর্বত্র ম্যানেজারদের এই Human Relations Training দেবার ধুম পড়ে গেল। Behavioural Scientists যারা, তারা জাতে উঠলেন বটে কিন্তু দেখা গেল যে এই ট্রেনিংও ম্যানেজারদের অ্যাটিচ্যুড তেমন কিছু একটা পাল্টাতে পারছে না। তাই এবারে মনোবিদ্যা অনুযায়ী মানুষের মনোদিগন্ত খুলে দেবার চেষ্টা হল। এলো Sensitivity Training বা T Group। এই

ট্রেনিং-এ যোগদানকারীদের দেখান হল যে তারা কত মূর্খ, কেননা তারা তাদের নিজেদের সম্পর্কে, নিজেদের মন সম্পর্কে কিছুই জানে না। এই ট্রেনিংয়ে যারা যোগদান করলেন তারা দেখলেন যে তারা নিজেদের সম্পর্কে কত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন। কত মনগড়া ধারণা, কত ভ্রান্ত সংস্কার তাদের মনের গহনে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে।

কিন্তু তবুও অভীষ্ট সিদ্ধ হলো না। Sensitivity Training মানবমনের সকল গলি ঘুপচি স্পষ্ট করে তুলতে পারল না। মানুষের মন এক বিচিত্র ব্যাপার। নিম্নলিখিত ভাবে আমরা এর খানিকটা আলোচনা করতে পারি:

লোকে আমাকে যেমন দেখে
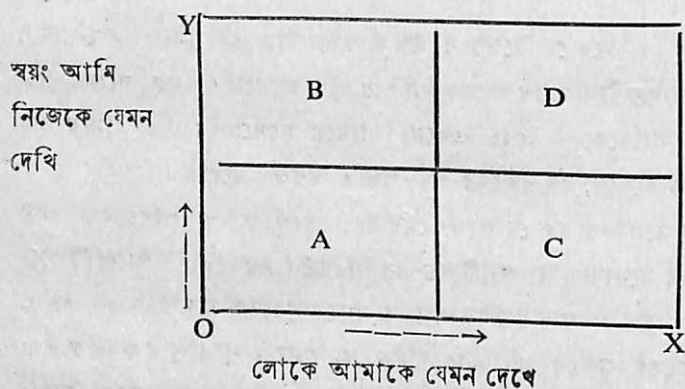
মনে করা যাক OX অক্ষে লোকে আমাকে কিরকম দেখে অর্থাৎ আমার সম্পর্কে কি ভাবে না ভাবে তা মাপা যায়, আর OY অক্ষে আমি স্বয়ং নিজেকে কেমন দেখি, ভাবি অর্থাৎ আমার সম্পর্কে আমার নিজের যে ধারণা তাই মাপা যায়।

এবারে একে একে A, B, C, D এই চারটি ক্ষেত্র কি সূচিত করছে তা দেখা যেতে পারে।

A-ক্ষেত্রে লোকে আমাকে যেভাবে দেখে অর্থাৎ আমায় যতটা জানে, আমার সম্বন্ধে যা ভাবে আমি নিজের সম্বন্ধে যা ভাবি, নিজেকে যেভাবে দেখাই, এই দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। অর্থাৎ লোকে আমাকে যেভাবে জানে আমিও নিজেকে সেভাবে দেখি।

B-ক্ষেত্রে আমি নিজেকে যেভাবে জানি, বুঝি, লোকে আমাকে সেভাবে

জানে না, বোঝে না বা দেখে না। অর্থাৎ আমার এই অংশটা লোকচক্ষুর আড়ালে কিন্তু আমার নিজের কাছে অজ্ঞাত নয়।

C-ক্ষেত্রে আমার নিজের যে অংশটা আমার কাছে অজ্ঞাত, সে অংশটা অন্যলোক যারা আমাকে দেখে তাদের কাছে পরিষ্কার। অর্থাৎ আমার যে দোষ, গুণ সম্পর্কে নিজে অবহিত নই অপরের কাছে সেগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট।

D-ক্ষেত্রে আমার এমন অংশ যার সম্বন্ধে শুধু লোকেই যে জানে না তাই নয় আমি নিজেও জানি না এবং বুঝি না। আমার মনের সেই গহনে অন্য কোন লোক বা আমি কেউই প্রবেশ করতে সক্ষম নই।

D-ক্ষেত্রের এই যে মনের অতল অংশ—এটিই আবার মানুষের সকল চিন্তা ভাবনা কর্মসাধনার আসল নিয়ামক। ফলতঃ এখানে যেহেতু পৌছানো গেল না সেজন্য T-Group পুরোপুরি সার্থক হতে পারল না। কিন্তু একটা লাভ হল—ম্যানেজাররা যে সবজান্তা নন, তাদেরও যে অনেক ত্রুটী আছে সেকথা তারা বুঝলেন।

কিন্তু যে জন্য এত কাণ্ড, সেই মোটিভেশন্, তার কিন্তু বিশেষ কিছু উন্নতি হ'ল না। স্ব-উদ্বুদ্ধতা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেল।

এবারে তাই মনে করা হল যে ম্যানেজারকে নিয়ে তো অনেক নাড়াচাড়া করা হয়েছে, এখন শ্রমিক-কর্মচারীকে কিছু শিক্ষাটিক্ষা দেওয়া দরকার। সমস্ত অফিস কাছারি কল-কারখানা জুড়ে শ্রমিক-কর্মচারীকে বোঝানোর জন্য প্রচার অভিযান শুরু করা হল। এই শিক্ষামূলক প্রচার অভিযান সংগঠিত করার জন্য ডাকা হল সংযোগ-বিজ্ঞানী বা Communications Expertদের। এরা নানা কায়দায় প্রচার অভিযান শুরু করলেন। মিটিং, আলোচনা সভা, বক্তৃতা, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির মাধ্যমে ম্যানেজাররা শ্রমিক কর্মচারীদের সম্বন্ধে কি ভাবছে, কি করছে ইত্যাদি ফলাও করে জানানো শুরু হল। কিন্তু এসব করেও ফলাফলের কোন ইতর বিশেষ হল না।

তখন ঠিক করা হল যে communication বা সংযোগ একতরফা হলেই চলবে না—শ্রমিক কর্মচারীদেরও কিছু বক্তব্য থাকতে পারে। অতএব ওই তরফের বক্তব্যও শোনার ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক কর্মচারীকে আহ্বান জানানো হল, বিভিন্ন গ্রুপের সংগে বিশেষ সাক্ষাৎকার এবং বৈঠকের ব্যবস্থাও করা হল। কিন্তু অবস্থার উন্নতি ঘটলো না।

পণ্ডিতেরা মাথা ঘামিয়ে ঠিক করলেন যে শ্রমিক-কর্মচারীরা যেহেতু প্রচলিত ব্যবস্থায় কোন আত্ম-পরিতৃপ্তি বা চরিতার্থতা অনুভব করে না সে-জন্যই স্ব-প্রণোদনা সুদূরপরাহত রয়ে যাচ্ছে। এ্যাচিভমেণ্ট বোধটা আনতে হবে—এবং সেজন্য যে কর্মী প্রত্যহ একহাজার বল্টু টাইট করে তাকে বোঝান হল যে সে সত্যিই প্রত্যহ আস্ত জিনিসটা, যেমন ট্রাক, মোটর কার, এরোপ্লেন বা বিরাট কোন যন্ত্র যেটা ঐ প্রতিষ্ঠানের উৎপন্নদ্রব্য, তৈরী করছে। একে বলা হল Job participation বা কর্মধারা নিয়ন্ত্রণে অংশ গ্রহণ। এর দ্বারা শ্রমিক-কর্মচারীকে বোঝানোর চেষ্টা হল যে তারাই আসল কর্মকে নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত করছে এবং তারা প্রত্যেকেই একটা বিরাট কিছু করছে। কিন্তু এতেও কিছু হল না। Job participation প্রকৃত চরিতার্থতা আনতে পারল না। প্রকৃত চরিতার্থতা বা তৃপ্তি আনতে হলে শুধু অংশগ্রহণেই হবে না, যে Job-এ অংশগ্রহণ সেই Job-এর প্রকৃতিও পাল্টানো প্রয়োজন, যে কাজের মধ্যে চ্যালেঞ্জ নেই সে কাজ করে খুব অল্পই তৃপ্তি পাওয়া যায় বা অ্যাচিভমেণ্টের আনন্দ মনে জাগে।Job participation অ্যাচিভমেণ্টের বোধটাকে কৃত্রিমভাবে জাগাতে চেয়েছিল, প্রকৃত অ্যাচিভমেণ্টকে নয়। এই প্রসংগে counselling-এর কথাও বলতে হয়। এই পদ্ধতিতে শ্রমিক-কর্মচারী যাতে কাউকে তাদের মনের সকল কথা খুলে বলতে পারে সেজন্য বাইরে থেকে কৌন্সেলর নামক তৃতীয় ব্যক্তির আমদানী করা হল। শ্রমিক-কর্মচারীর মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তথা চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা যাতে কর্মধারার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে সেজন্য কৌন্সেলর নিয়োগ করা হল। এদের দায়িত্ব হল কর্মীদের কথা শোনা, তাদের মনোভাব এবং চিন্তাধারার শরিক হওয়া এবং কায়দা করে কর্মীদের চিন্তাধারার অযৌক্তিকতা বুঝিয়ে দেওয়া। এই ব্যবস্থাও মার খেল। মোটি-ভেশন্ বা স্ব-প্রণোদনার কিছু ফল পাওয়া গেল না।

কিন্তু এগুলোর মাধ্যমে খানিকটা লাভ যে হয়নি তা নয়। যে কোন ব্যাপারেই ট্রেনিংয়ের মূল্য রয়েছে। যে সমস্যার পূর্ণ সমাধান করা যায় না সেই সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে শুধু আলোচনা করলেও সমস্যা সমাধানের পথ খানিকটা সুগম হয়। ম্যানেজার ও শ্রমিকের পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হলে উভয়েরই উভয়কে বেশী করে জানতে হবে, উভয়ের নিজস্ব চিন্তাধারা সম্পর্কে পরস্পরের পরিচয়ের পরিধি বাড়াতে হবে। এ ব্যাপারে

ম্যানেজারের দায়িত্ব অনেক বেশী। কাজেই ম্যানেজারের ট্রেনিং, ম্যানেজমেণ্ট ডেভেলপমেণ্ট প্রোগ্রাম এগুলো অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমাগত অগ্রগতির সংগে সংগে পুরোনো ধ্যানধারণাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে নতুন নতুন ধ্যানধারণার জন্ম হচ্ছে। ম্যানেজারকে এর সংগে পাল্লা দিয়ে চলতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং নতুন নতুন ধ্যানধারণার বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করতে হবে। এর ফলে সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান না হলেও কিছু এসে যায় না।

বস্তুতঃ এ ব্যাপারটা বোধহয় অংকের ভাষায় বলতে গেলে অনেকটা ক্যালকুলাসের লিমিটের মত। জগতের যে সমস্ত তত্ত্ব প্রাকৃতিক বস্তুকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষ ও তার পরিবেশ এবং মানুষে-মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে, তার কোনটিই বৈজ্ঞানিক সত্য নয়। অর্থাৎ এগুলো বাস্তবে যে পুরোপুরি কার্যকরী হবে এমনটা হলফ্ করে বলা যায় না। ক্যালকুলাসের 'লিমিটে' যেমন পৌছানো যায় না. একটু বাকী থেকে যায়, ঠিক তেমনি, অর্থবিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ম্যানেজমেণ্ট ইত্যাদি তাবৎ শাস্ত্র যেখানে মানুষ প্রধান উপজীব্য, এগুলোর তত্ত্বসমূহ ব্যবহারিক জগতে প্রযুক্তিতে সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে না। কিন্তু তাই বলে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না—ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন ধারণাসমূহকে উপলব্ধি করতে হবে এবং উন্নততর ফললাভের জন্য বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টাও করতে হবে।

থিয়োরী Yর নতুন ধারণা থেকে শুরু করে ম্যানেজমেণ্ট ট্রেনিংয়ের সিলেবাস পর্যন্ত সব কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষকে ঠিকমত বুঝতে পারা। আসল কথা হচ্ছে মানুষকে মানুষ বলে মর্যাদা দিতে হবে, মানুষে মানুষে সম্পর্কের যে নানারকম ঘাত-প্রতিঘাত আছে তাকে বুঝতে হবে। শিশু থেকে বয়স্ক মানুষের বিচক্ষণ মানসিকতায় উত্তরণে যে বিভিন্ন পর্য্যায় আছে তাকে স্বীকার করতে হবে এবং এও মানতে হবে যে আজীবন প্রত্যেক মানুষ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করে করে চলে এবং ইমম্যাচিওরিটি থেকে পূর্ণ ম্যাচিওরিটিতে উত্তরণের প্রচেষ্টাই মানুষের বৈশিষ্ট্য।

ইমম্যাচিওরিটি	ম্যাচিওরিটি
১। নির্লিপ্ততা	১। উদ্যমশীল, সচেষ্ট হওয়া
২। পরনির্ভরতা	২। স্ব-নির্ভর হওয়া

ইমম্যাচিওরিটি	ম্যাচিওরিটি
৩। শুধুমাত্র এক ধরণের আচরণ ও ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া	৩। বিভিন্ন ধরণের ব্যবহার ও আচরণে সমর্থ হওয়া অর্থাৎ যোগ্যতা অর্জন করা
৪। কোন বিষয়েই বিশেষ মনোযোগ বা আগ্রহ না দেওয়া	৪। গভীর আগ্রহী ও বিশেষ মনোযোগী হওয়া
৫। বর্তমানের বাইরে দৃষ্টিপাত না করা, ভাবতে না চাওয়া	৫। অতীত-ভবিষ্যৎ জ্ঞান-সাপেক্ষে সুদূর প্রসারী দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করা
৬। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিম্ন-তর দায়িত্বের কর্মসম্পাদনে ইচ্ছুক হওয়া	৬। যোগ্যতা অনুযায়ী অথবা তদপেক্ষা বেশী দায়িত্বপূর্ণ কর্মগ্রহণে ইচ্ছুক হওয়া
৭। আপন সামর্থ সম্বন্ধে অনবহিত থাকা	৭। নিজেকে বোঝা, নিজের শক্তিমত্তা সম্বন্ধে সচেতন থাকা এবং নিজেকে পুরো স্ববশে রাখা।

ইমম্যাচিওরিটি এবং তদ্‌বিপরীত ম্যাচিওর ব্যবহারের এই যে সারণী ওপরে দেওয়া হল—সপ্তধা-বিভক্ত এই continum বা পরাবৃত্তের কোথাও না কোথাও আমরা প্রত্যেকেই অবস্থিত। প্রত্যেক মানুষই আপন উন্নতির চেষ্টা করে এবং এই চেষ্টাই সুস্থ মানসিকতার পরিচয়বহ। খুব কম মানুষই এই পরাবৃত্তের চরমে পৌঁছোয় অর্থাৎ পূর্ণ ম্যাচিওরিটি অর্জন করতে পারে, কিন্তু তাই বলে হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ম্যানেজার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি কর্মচারীই ইম্ম্যাচিওরিটি ম্যাচিওরিটি পরাবৃত্তের কোন না কোন পর্য্যায়ে রয়েছে। ম্যানেজারের পক্ষে এই উপলব্ধি শুধু যে তার আত্মোন্নতির সহায়ক তাই নয়, শ্রমিক কর্মচারীরও উন্নতির সহায়ক। ম্যানেজারকে কর্ম, কর্ম-পদ্ধতি এবং কর্ম পরিবেশে এমন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে হবে যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিই পূর্ণ বিকাশ তথা ম্যাচিওরিটির উচ্চতর পর্য্যায়ে উত্তরণের সুযোগ পায়। এই সুযোগ যেখানে যত বেশী উপস্থিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যের সংগে সংগঠনের উদ্দেশ্যের সাযুয্যতা সেখানে তত বেশী।

কিন্তু বাস্তবে কি দেখা যায়? বাস্তবে কিভাবে ম্যানেজারগণ তাদের

দায়িত্ব নির্বাহ করে ? চারটি সিস্টেমের পরাবৃত্তে আমরা ম্যানেজারের কর্ম-পদ্ধতিকে দেখাতে পারি। প্রথম সিস্টেম থেকে চতুর্থ সিস্টেম পর্যন্ত বিস্তৃত পরাবৃত্তের কোন না কোন পর্যায়ে প্রত্যেকটি সংগঠন অবস্থিত এবং প্রত্যেক ম্যানেজারই এই পরাবৃত্তের কোন না কোন পর্যায়ে থেকে সাংগঠনিক কাজকর্ম তথা সংগঠনাধীন ব্যক্তিবর্গের কাজকর্ম চালনা করছে।

প্রথমতঃ শোষণমূলক কর্তৃত্বের নীতি। এই সিস্টেম পাক্কা থিয়োরী X মেনে চলে। সংগঠন তার উদ্দেশ্য তথা কর্মধারা ওপর থেকে স্থিরীকৃত তথা নির্দিষ্ট করে দেয়, সাধারণ কর্মচারী থেকে শুরু করে তাবৎ দায়িত্বশীল কর্মীবৃন্দ পর্যন্ত সকলকে সংগঠনের নির্দেশ মেনে চলতে হয়। নির্দেশ অমান্য করা তো দূরে থাক, নির্দেশের ভুলত্রুটী তথা গুণাগুণ বিচারেরও কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আদেশ অমান্য করলে শাস্তিপ্রদান, সে তো বলাই বাহুল্য। তাবৎ কর্মচারীকে কর্মে প্রণোদিত করার জন্য সেই কথামালার গর্দভ, সামনে খাবার পেছনে ছড়ি—carrot and stick—পলিসিই নেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ উদারনৈতিক কর্তৃত্বের নীতি। এই সিস্টেম প্রথমটির চেয়ে একটু উন্নততর। প্রভু-ভৃত্য বা সামন্ততান্ত্রিক সমাজের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক অনেকটা এই নীতির সমানুপাতী। ভৃত্যের কিছু কিছু ভুলত্রুটী ক্ষমা করে দেওয়া হয়, ভৃত্যকে মাঝে মাঝে দু একটা কাজ নিজ চেষ্টা তথা দায়িত্বে করতে দেওয়া হয়। ভৃত্যের ভয় আছে কিন্তু প্রভু সর্বদা ক্রোধপরায়ণ নন—শুধু তার মন যুগিয়ে চলাটাই আসল কথা।

তৃতীয়তঃ পরামর্শমূলক নীতি। এই সিস্টেমে অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভালো। সাধারণভাবে সাংগঠনিক উদ্দেশ্য তথা নীতি যদিও ওপর থেকে নির্ধারিত হয় কার্যকালে কর্মচারীবৃন্দ আপন জ্ঞান বুদ্ধি মত ডিসিশন্ নিয়ে কাজ করতে পারে। এই সিস্টেমে কর্মচারীদের অনেকখানি বিশ্বাস করা হয় এবং কর্মচারীরাও সে সম্বন্ধে অবহিত থাকে।

চতুর্থ নীতি হচ্ছে যোগদান মূলক। এই সিস্টেমটি একেবারে পুরোপুরি থিয়োরী Y মেনে চলে। এখানে কর্মীবৃন্দের উপর সম্পূর্ণ আস্থাজ্ঞাপন করা হয়। এই সিস্টেমে ডিসিশন্ প্রোসেসে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল স্তরের কর্মীবৃন্দই অংশগ্রহণ করে। উদ্দেশ্য স্থির করা থেকে শুরু করে কর্মধারার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ পর্য্যন্ত সকল স্তরেই কর্মচারীবৃন্দ অংশগ্রহণ করে থাকে। সংগঠন কোন

কিছুই কর্মীবৃন্দের ওপর চাপিয়ে দেয় না, কর্মীবৃন্দের স্বকীয় যোগদানের মাধ্যমেই সংগঠনের রূপ-রেখা গড়ে ওঠে।

এই চারটি সিস্টেমের পর্য্যালোচনায় দেখা যায় যে দ্বিতীয় সিস্টেম প্রথমটির নিকটবর্তী আর তৃতীয় সিস্টেম চতুর্থটির সমীপবর্তী। প্রথম ও চতুর্থ সিস্টেম যেহেতু থিয়োরী X ও থিয়োরী Yর অনুসরণ করে সেহেতু দ্বিতীয় ও তৃতীয় সিস্টেমকে থিয়োরী X, থিয়োরী Y পরাবৃত্তের মধ্যবর্তী দুটি পৃথক বিন্দুতে অবস্থিত বলে সূচিত করা যেতে পারে। এই চারটি সিস্টেমের তুলনামূলক বিচার দুটো দিক দিয়ে করা যেতে পারে। যে কোন সংগঠনই এই চারটি সিস্টেমের একটিকে মোটামুটিভাবে অনুসরণ করে ; কিন্তু তা ঠিকমত বুঝতে হলে অর্থাৎ কোন্ নির্দিষ্ট সংগঠন কি সিস্টেম মেনে চলছে তা ধরতে হলে এই বৈশিষ্ট্যগুলো বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথমতঃ communication বা সংযোগ। প্রথম সিস্টেমে সংযোগ বল্লে কিছু নেই। ওপর থেকে শুধু আদেশ আসে অধঃস্তন কর্মীর কাছে। দ্বিতীয় সিস্টেমের অবস্থাটাও তাইই। তবে মাঝে মাঝে খবরাখবর নীচের থেকে ওপরওয়ালার কাছে যায়। তবে সেটা হঠাৎ হঠাৎ ঘটে অর্থাৎ এর মধ্যে কোন সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন নেই। তৃতীয় সিস্টেমে সংযোগ উপরে নীচে উভয়দিকেই প্রবাহিত হয়, আর চতুর্থ সিস্টেমে শুধু উপরে নীচে নয় পাশাপাশি অর্থাৎ অধঃস্তন কর্মীদের মধ্যেও স্তর অনুযায়ী প্রয়োজনের স্বার্থে সুনির্দিষ্ট সংযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের মধ্যেও সমদায়িত্বসম্পন্ন কর্মিগণের মধ্যে সংবাদ আদান প্রদানের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ ইনফর্মাল অরগানাইজেশন। যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনেই বিধিবদ্ধ সংগঠন, রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের বাইরে কিছু অলিখিত প্রথা তৈরী হয় এবং কালক্রমে কিছু গ্রুপের জন্ম হয়। একসাথে কাজ করতে করতে বিভিন্ন ব্যক্তি নিজেদের পছন্দ, মতাদর্শ, আগ্রহ ইত্যাদির ভিত্তিতে যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তোলে তার থেকেই গ্রুপের উৎপত্তি হয়। ফর্মাল সংগঠন ও ইনফর্মাল সংগঠন যে কোন প্রতিষ্ঠানেই উপস্থিত। অফিস-কাছারী, কল-কারখানা, হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কোন কিছুই এর আওতার বাইরে নয়। এই ফর্মাল-ইনফর্মাল সংগঠনের gap কতটা তা দিয়েই বিচার

করতে হবে সংগঠনটি কোন্ সিস্টেমে পরিচালিত হয়, ম্যানেজারীয় কর্মধারা কিভাবে চালিত হয় এবং সংগঠনে অনুসৃত ম্যানেজমেণ্ট পদ্ধতির কোন পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে কি না। প্রথম সিস্টেমে ইনফর্মাল সংগঠন ফর্মাল সংগঠনের কাজকর্মের ও কর্মনীতির পক্ষে বাধাস্বরূপ। দ্বিতীয় সিস্টেমে ইনফর্মাল সংগঠন প্রতিনিয়ত না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাধাস্বরূপ। তৃতীয় সিস্টেমে ইনফর্মাল সংগঠন বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ফর্মাল সংগঠনের উদ্দেশ্যসমূহের সমর্থক। চতুর্থ সিস্টেমে ফর্মাল ইনফর্মাল সংগঠনের বিভেদ একেবারে মুছে যায় কেননা এখানে উভয়ের উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। ইনফর্মাল সংগঠন যেকোন প্রতিষ্ঠানেই গড়ে ওঠে কিন্তু তা সংগঠনের নিজের উদ্দেশ্যসাধনের পক্ষে বাধাস্বরূপ হবে কি না তা নির্ভর করে ম্যানেজমেণ্ট পলিসি বা স্টাইলের ওপর।

সংগঠনের তথা ম্যানেজমেণ্টের পক্ষে আদর্শ সিস্টেম কোন্‌টি তা না হয় বোঝা গেল। অর্থাৎ ম্যানেজমেণ্ট স্টাইলটা কিরকম হওয়া উচিত তা না হয় মোটামুটিভাবে জানা গেল। কিন্তু এই চারটা সিস্টেম নিয়ে যে পরাবৃত্তের পরিধি তার ঠিক কোন্ পয়েণ্টে ম্যানেজার অবস্থান করছে তা যদি সে নিজে না বোঝে অথবা তাকে বোঝান না যায় তাহলে ম্যানেজমেণ্ট স্টাইলের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করা খুব সোজা ব্যাপার হবে না। তাছাড়া আরেকটা ভাববার ব্যাপার রয়েছে—মানুষই যে সংগঠনের প্রাণ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু মানুষী শ্রমের ফলস্বরূপ যে 'উৎপাদন', তার জন্যই সংগঠন। উৎপাদন কার্যের জন্যই সংগঠনের উদ্ভব। উৎপাদনকর্ম ছাড়া সংগঠনের আর কোন উদ্দেশ্য নেই। অতএব শুধু 'মানুষ মানুষ' বলে চেঁচামেচি করে, মানুষের দায়দায়িত্ব, মনোবৃত্তি, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদির কথা ভেবে, উৎপাদন কার্যের বারোটা বাজালে চলবে না। উৎপাদনের কথাও বিশেষভাবে ভাবতে হবে। ফলতঃ 'ম্যানেজারীয় গ্রীডের' ধারণার উদ্ভব হ'ল যাতে প্রথম থেকে চতুর্থ সিষ্টেম পর্যন্ত ব্যাপ্ত পরাবৃত্তের কোন্ স্থানে ম্যানেজার অবস্থান করছে তা যেমন বোঝান যায় ঠিক তেমনি একদিকে উৎপাদন অন্যদিকে মানবিক সম্পদ এই দুইয়ের প্রগতির সংমিশ্রণ ম্যানেজার কতটা ঘটিয়েছে তাও বোঝানো যেতে পারে।

ম্যানেজারিয়াল গ্রীড্ আসলে একটা চার্ট ছাড়া আর কিছু নয়। এতে

অনুভূমিক ও উলম্ব নয়টা করে গ্রীড্ আছে যাতে (৯×৯) ৮১টা সম্ভাবনার অভ্যুদয় হয়।
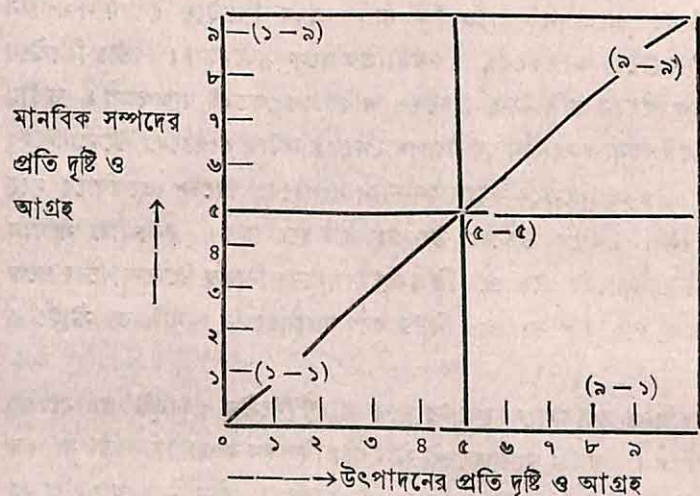
মনে করা যাক অনুভূমিক অক্ষে আমরা ম্যানেজারের উৎপাদনের প্রতি দৃষ্টি ও আগ্রহ মাপতে পারি আর উলম্ব অক্ষে ম্যানেজারের মানবিক সম্পদের প্রতি দৃষ্টি ও আগ্রহ মাপা যায়। (৯—১) ষ্টাইলে কাজকর্ম পরিচালনা করার যে ব্যবস্থা তার সংগে প্রথম সিষ্টেম বা থিয়োরী X একেবারে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। এই ব্যবস্থায় উৎপাদনই আসল—মানুষকে উৎপাদনের যন্ত্রের চেয়ে বেশী কিছু মনে করার প্রয়োজন নেই।

আবার ঠিক উল্টোভাবে (১—৯) পদ্ধতিতে মানুষই প্রধান উপজীব্য। উৎপাদনের দাবী সেখানে অগ্রাহ্য। তাই উৎপাদনের প্রতি যেমন মনোযোগ নেই তেমনি কোন নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতিও স্থিরীকৃত নেই। কাজ এখানে আসল নয়, মানুষে মানুষে সহযোগিতাই এখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তাই এখানে মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তা উৎপাদন কাঠামো ভিত্তিক না হয়ে ব্যক্তিগত ভিত্তিতেই নির্ধারিত হয়।

প্রথম পদ্ধতিটিকে তাই টাস্ক-মূলক আর দ্বিতীয়টিকে ক্লাব-মূলক বলা যায়। অর্থাৎ প্রথমটিতে (৯—১) যেন তেন প্রকারেণ কাজ আদায় করাই আসল কথা, আর দ্বিতীয়টিতে (১—৯) মানুষে মানুষে সুসম্পর্কই আসল, যেমন ক্লাব-টাব্‌এ হয়ে থাকে।

অতএব আদর্শ ষ্টাইল কোন্‌টি ? নিশ্চয়ই সেই ষ্টাইলটাই আদর্শ যেখানে উৎপাদন এবং মানুষ উভয়েই গুরুত্বপূর্ণ—যেখানে উভয়ের প্রতিই সমান দৃষ্টি ও আগ্রহ বিদ্যমান, যেখানে মানুষে মানুষে যে সুসম্পর্ক তা কর্মভিত্তিক এবং কাজের জন্যই গড়ে ওঠে এবং মানুষ ও উৎপাদন উভয়ই ম্যানেজমেণ্টের কাছে সমগুরুত্বপূর্ণ হয়। তাহলে (১—১), (৫—৫), (৯—৯) এগুলোকেই কি আদর্শ পদ্ধতি বলা যায়? (১—১) পদ্ধতি অবশ্যই (১—১), (৫—৫), (৯—৯) রেখার নিম্নপ্রান্তে অবস্থিত। কিন্তু এখানে যদিও উৎপাদন এবং মানবিক সম্পদ উভয়কেই সমদৃষ্টিতে দেখা হয় তাহলেও এ মিশ্রণ সর্বোত্তম নয়। এখানে ম্যানেজারের সবকিছুতেই 'গা-ছাড়া' ভাব—যেন আছি অথচ নেই এই মনোবৃত্তিই কাজ করে। ফলতঃ চামড়া বাঁচাবার জন্য বা অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যতটা না করলে নয়, ম্যানেজার ঠিক ততটা দৃষ্টিই উৎপাদন এবং মানবিক সম্পদে প্রদান করেন। অতএব এ অবস্থা কোনদিক দিয়েই বাঞ্ছনীয় বা আশানুরূপ নয়—কেননা এতে কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয় না। (৯—৯) ষ্টাইলটি-কে সর্বোত্তম বা আদর্শ বলা যায়। এখানে অনুসৃত ব্যবস্থা থিয়োরী Y বা পূর্ব কথিত চতুর্থ সিষ্টেমের পন্থা-পদ্ধতিকে সম্পূর্ণভাবে অনুসরণ করে। এই ষ্টাইলে হয়তো কেউই পৌছতে পারেন না কিন্তু (৫—৫) পর্যায়ে অনেকেই পৌছতে পারেন। তাই (৫—৫) থেকে (৯—৯) এই রেখাকেই আমরা আদর্শ ষ্টাইলের ক্রমবর্ধমান প্রগতির পথ বলে অভিহিত করতে পারি। (৫—৫) পদ্ধতিতে ম্যানেজার অনেকাংশ থিয়োরী Yর ধারণাদিতে বিশ্বাসী—ফলতঃ মানুষের স্বাভাবিক বিকাশের প্রচেষ্টায় আগ্রহশীল। উৎপাদনের প্রতি আগ্রহ তথা চিন্তা মানবিক সম্পদের ব্যবহারের পরিপন্থী তো নয়ই বরং সমানুপাতী। এই ষ্টাইলে কর্মরত ম্যানেজার প্র্যাক্‌টিকাল লোক এবং তাই তার ডিসিশন্‌সমূহ প্র্যাকটিকাল হয়—ম্যানেজারের নিজস্ব ধারণা তথা সংস্কারসমূহ প্র্যাক্‌টিকালিটির কাছে পরাস্ত হয়। (৯—৯) ব্যবস্থায় ম্যানেজার উন্মুক্তমনা ও সংবেদনশীল। মানবিক সম্পদের উৎপাদনে অংশগ্রহণ এতই সম্পূর্ণ ও যথাযথ যে প্রগতিশীল চিন্তাধারা তথা কর্মপদ্ধতি কর্মধারার বিবর্তন ও প্রগতিতে সদাসহায়ক। ব্যক্তি সেখানে সংগঠনে সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছা-উৎসর্গীকৃত। গ্রুপের উদ্দেশ্য সেখানে সংগঠনের উদ্দেশ্যের সর্বোত্তম ও সম্পূর্ণতম সংঘটন করা। এই ষ্টাইলে নিজস্ব একটা টীম স্পিরিটের পরিচয় সর্বত্র পরিস্ফুট হয়।

সবই ভালো। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, কি করে কিছু subjective বা মন্ময় ধ্যানধারণা, অনুভূতি ও প্রবণতাকে সংখ্যাবদ্ধ করে আংকিক প্রকরণে সূত্রাকারে দেখান যায়। কিছু আদর্শ উদাহরণ বহু খাটাখাটনি করে প্রস্তুত করা যেতে পারে কিন্তু বাস্তবের কোন সংগঠনের ম্যানেজমেণ্ট ষ্টাইলকে কোয়ান্টিফাই বা সংখ্যাবদ্ধ করা প্রায় অসম্ভব পর্য্যায়ে পড়ে, ফলতঃ এই গ্রীডের ব্যবহার মূলতঃ ম্যানেজারের ট্রেনিং তথা ম্যানেজার ডেভেলাপমেণ্ট প্রোগ্রামেই অদ্যাবধি সীমিত রয়েছে। কিন্তু সীমিত ব্যবহার ও উপযোগের মধ্যেও এই গ্রীড যেভাবে প্রচলিত ম্যানেজমেণ্ট সংক্রান্ত ধারণাসমূহকে সংহত ও চার্টবদ্ধ করেছে তা এককথায় অতুলনীয়।

কিন্তু এর মাধ্যমেও মোটিভেশনের খুব একটা হেরফের হ'ল না। অনেকের মনেই সন্দেহ জাগল যে মোটিভেশন-ফেশন কোন কাজের কথা নয়। বাস্তবে মোটিভেশন নিয়ে আসা বা সম্ভব করে তোলা প্রায় অসম্ভব পর্য্যায়েই বুঝি পড়ে। ফলে ভাবনা চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা আরো জোরদার হল। আরো কিছু জানা গেল। বোঝা গেল যে তৃপ্তি আর অতৃপ্তি, সন্তোষ আর অসন্তোষ একটা আরেকটার বিপরীত পিঠ নয়। অসন্তোষ দূরীভূত করলেই সন্তুষ্টি আসে না। অতৃপ্তির কারণগুলো দূর করলেই মানুষ পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করে না। অর্থাৎ তৃপ্তি ও সন্তুষ্টি বিধান শুধুমাত্র অতৃপ্তি বা অসন্তোষের নিবৃত্তি ঘটলেই আপনাআপনি চলে আসে না। পরিপূর্ণ তৃপ্তিলাভ বা সন্তোষ বিধানের পক্ষে আবশ্যিক কতকগুলো বিশেষ ও নিজস্ব শর্ত রয়েছে যেগুলোর পূর্তি ব্যতিরেকে তৃপ্তি বা সন্তুষ্টির উৎপত্তি হয় না। সূত্রাকারে বললে এভাবে বলা যেতে পারে

তৃপ্তি = অতৃপ্তিহীনতা + তৃপ্তির কারণগুলোর পূর্তি

অন্ন-বস্ত্র-গৃহ মানুষের মৌল চাহিদা এবং এগুলোর পূর্তি না হলে মানুষের পক্ষে কোন কাজই সম্ভব হয় না—কেননা এই চাহিদাগুলোর পূর্তি মানুষের জীবনধারণের পক্ষে অর্থাৎ প্রাণে বেঁচে থাকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বেঁচে থাকার প্রেরণাই মানুষের আসল প্রেরণা—এই প্রেরণায়ই মানুষ ক্ষুধার নিবৃত্তি ঘটায়, অর্থ উপার্জন করে, অর্থাৎ অর্থ উপার্জনের যে তাগিদ তার পেছনে মানুষের প্রাণে বেঁচে থাকার যে মূল প্রেরণা তাইই কাজ করে। এই প্রেরণা মানুষের সহজাত অর্থাৎ বেঁচে থাকতে হলে যে ক্ষুধা মেটাতে হবে

তা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না, বাঁচতে হলে প্রকৃতির বিরুদ্ধে যে লড়াই করতে হবে তা কাউকে শিখিয়ে দিতে হয় না। এই সহজাত প্রেরণাই মানুষের স্বভাব। এই স্বভাবের বশবর্তী হয়েই মানুষ বেঁচে থাকার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য কাজকর্মে অংশগ্রহণ করে। মানুষের মৌল প্রয়োজনগুলো মেটাবার জন্য সহজাত প্রেরণায় মানুষ যে চেষ্টা করে, যে কাজকর্মগুলো করে, সেগুলো কালক্রমে প্রবৃত্তিগতভাবে মানুষের স্বভাবের অংগীভূত হয়ে যায়। ক্ষুধার নিবৃত্তি, প্রাকৃতিক কষ্টে না ভোগা (বস্ত্র ও গৃহের প্রয়োজন) ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো এই জাতীয় এবং তাই এগুলোর অপূর্ণতা বা অপ্রাপ্তিতে মানুষের অতৃপ্তি থেকে যায়, অসন্তোষ দূরীভূত হয় না, মানুষ অসন্তুষ্ট থেকে যায়।

কিন্তু মানুষের আরেক জাতের প্রেরণা রয়েছে যা অন্য কোন প্রাণীর নেই, এই প্রেরণা হচ্ছে আপনাকে জানার, বোঝার, আত্মোপলব্ধির অর্থাৎ কোন কিছু এ্যাচিভ করার ইচ্ছা এবং সেই প্রেরণাগত প্রচেষ্টায় আত্মোন্নতি তথা আত্মোপলব্ধির আনন্দলাভ করা। প্রথম প্রকারের প্রয়োজন মিটলে মানুষের যেমন অসন্তোষের কারণসমূহ দূরীভূত হয়, ঠিক তেমনি দ্বিতীয় প্রকারের প্রয়োজনসমূহের পূর্তিতে মানুষের আত্মতৃপ্তি বা আত্মসন্তুষ্টি জন্মায়। প্রথম প্রকারের অর্থাৎ অসন্তোষ দূরীকরণের উপাদানসমূহকে 'হাইজিন', 'কিতা' তথা 'মেণ্টেনান্স ফ্যাক্টরস্' নামে অভিহিত করা হয় আর দ্বিতীয় প্রকারের অর্থাৎ সন্তোষ অর্জনের উপাদানসমূহকে 'মোটিভেটরস' বলা হয়ে থাকে। অতএব আমরা আগের সূত্রটাকে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করতে পারি :

তৃপ্তি = হাইজিন্ + মোটিভেটরস্

অর্থাৎ অতৃপ্তির কারণগুলো দূর করতে হলে 'হাইজিন' উপাদানগুলোর পূর্তি দরকার, আর পরিতৃপ্তি আনয়ন করতে হলে 'মোটিভেটরস্' গুলোকে চালু করতে হবে।

কোন কর্ম বা job-এর সংগে মোটিভেটরগুলো একান্তভাবে সম্পৃক্ত অর্থাৎ এর মিলন এমন অবিচ্ছেদ্য যে, মনে হয় যেন এগুলো কর্মেরই অংগ বিশেষ, এগুলোকে কর্ম থেকে পৃথক করা যায় না। দায়িত্ব, অ্যাচিভ্‌মেণ্ট, আত্মোন্নতি তথা গ্রোথ, স্বীকৃতি ইত্যাদিকেই আমরা মোটিভেটর উপাদান নামে অভিহিত করতে পারি। আর হাইজিন উপাদান বলতে আমরা সংগঠনের নিয়মকানুন, উর্দ্ধতন নিম্নতর তথা সমপর্য্যায়ের কর্মীবৃন্দের মধ্যে

পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যক্তিগত জীবন, আর্থিক আয়, কর্ম-পরিবেশ ইত্যাদিকেই চিহ্নিত করতে পারি। প্রথম প্রকারের উপাদানগুলোকে কর্মের সংগে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াতে হবে যে কেবলমাত্র উক্ত কর্মসাধনের মাধ্যমেই এই উপাদানগুলো সাধিত হতে পারে, অর্থাৎ কর্মসাধন ব্যতিরেকে এই উপাদান-গুলো অর্জনের আর কোন পথ থাকে না। দ্বিতীয় প্রকারের উপাদানগুলো যেহেতু কর্মপদ্ধতি তথা কর্মনীতির সংগে জড়িত সেজন্য সংগঠনে অনুসৃত কর্ম-নীতি বা কর্মপদ্ধতিকে এই উপাদানসমূহ সাধনের পক্ষে যোগ্য পথে চালনা করা উচিত। মোটিভেটরগুলো যেমন কর্ম বা job-এর সংগে intrinsic সম্বন্ধে যুক্ত ঠিক তেমনি হাইজিনগুলো যে কোন নির্দিষ্ট কর্মের সংগে extrinsic সম্বন্ধে যুক্ত। অর্থাৎ কিছু উপাদান কর্মের অন্তরংগ বা অন্তর্লীন আর কিছু উপাদান কর্মের বহিরংগে অবস্থিত। ম্যানেজারের কাছে এই দুই দিকই সমান গুরুত্ব-পূর্ণ—কেননা এ দুয়ের সাধনেই আছে অসন্তোষের নিবৃত্তি আর সন্তোষের উদ্ভব।

এতদিন ধরে ম্যানেজার বহিরংগের উপাদানগুলো অর্থাৎ অসন্তোষ নিবৃত্তির উপাদানসমূহের পরিপূর্তির পথেই মোটিভেশন্ ঘটানোর চেষ্টা করেছে, ফলে অসন্তোষ নিবৃত্তি যদিও বা কিছু ঘটে থাকে, সন্তুষ্টি আসে নি এবং সেজন্য মোটিভেশন যে সুদূরে ছিল, সেখানেই রয়েছে। এখন তাই ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে কর্মের মধ্যেই কায়দা করে মোটিভেটরগুলোকে সন্নিবদ্ধ করা যাতে কর্ম-সম্পাদনের মাধ্যমেই পরিতৃপ্তি আসে এবং শ্রমিক কর্মচারী মোটিভেটেড বা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধ হয়। প্রত্যেকটি কর্ম সে শ্রমিকের কাজ হোক বা করণিকের কাজই হোক, পুংথানুপুংখভাবে বিশ্লেষণ করে, মাথা ঘামিয়ে, ব্রেন খাটিয়ে দেখতে হবে কিভাবে সন্তোষ উৎপাদনের উপাদানসমূহকে এতে সন্নিবেশিত করা যায়। একমাত্র এইখানেই রয়েছে মোটিভেশনের সাধন—অন্য কোথাও নয়।

বস্তুতঃ এতাবৎকাল পার্সোনেল ম্যানেজমেণ্ট সংক্রান্ত ধারণাসমূহ প্রধানতঃ তিনটি তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণে প্রসার লাভ করেছে। এই তিনটি দৃষ্টিকোণ হচ্ছে যথাক্রমে সংগঠন-তত্ত্ব, মানবিক ইঞ্জিনীয়ারিং এবং আচরণ-বিজ্ঞান।

প্রথম দৃষ্টিভঙ্গীতে অর্থাৎ সংগঠন-তত্ত্ব অনুযায়ী বিচারে মানুষ ইররাশনাল জীব। তার চাহিদা ও প্রয়োজন এত বিভিন্ন রকমের এবং এত ইলাস্টিক যে

একমাত্র প্র্যাগম্যাটিজম্ ছাড়া আর কোনও ভাবেই এর সমাধান সম্ভব নয়। কাজকর্মের সংগঠন যদি যথাযথ হয়, তাহলে কর্মপদ্ধতি তথা কর্মের প্রকার প্রকরণও যথাযথ হবে। ফলতঃ কর্মের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীও আশানুরূপ হবে। এক কথায় বলতে গেলে কর্ম (job) ও কর্মের যুক্তিপূর্ণ সংগঠনই (Rationalisation) আসল ব্যাপার। মানুষ স্বাভাবিকভাবে নিজেকে সংগঠনের সঙ্গে এ্যাডজাস্ট করে নেবে এবং কাজকর্ম অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে। দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণে মানুষকে প্রায় মেশিনের মতই গণ্য করা হয়। যন্ত্র যেমন দৃঢ়সংবদ্ধ, পরস্পর সাপেক্ষ, যুক্তিনিষ্ঠ পদ্ধতিতে ক্রমান্বয়ে অবিরাম কাজ করে চলে, ঠিক তেমনি যদি কর্মকে (Job) যুক্তিনিষ্ঠ, পরস্পর সাপেক্ষ, কঠোর নিয়মানুবর্ত্তীতায় সংগঠিত করা যায় তাহলে মানুষ নামক যন্ত্র থেকে সর্বোত্তম কাজ আদায় করা যায় এবং এর দ্বারাই কাজকর্মের প্রতি মানুষের এ্যাটিচ্যুড কর্মধারার সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গীতে গড়ে ওঠে।

তৃতীয় দৃষ্টিকোণে মানুষ ও মানুষের আচরণের ওপরই জোর দেওয়া হয়। মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্ক, উর্দ্ধতন নিম্নতর শ্রেণীর কর্মীবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, একই স্তরের কর্মীবৃন্দের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত প্রতিঘাত অর্থাৎ গ্রুপের উৎপত্তি, গ্রুপের আচরণ, বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ইত্যাদি—এই সম্পর্কসমূহের টানাপোড়েনে উদ্ভূত এ্যাটিচ্যুড বা অনুভূতিই সংগঠনের কর্ম প্রকৃতির নির্ধারক ও নিয়ামক। অতএব ম্যানেজারের 'এ্যাটিচ্যুড' যদি বিজ্ঞান সম্মত হয়, তাহলে কর্মপদ্ধতি ও সংগঠন প্রক্রিয়ার সর্বোত্তম সংস্থান সম্ভব হয়ে উঠবে।

মোটামুটিভাবে বলতে গেলে যে কোনও সংগঠনের পার্সোনেল পলিসি এই "দর্শন সমূহের" ভিত্তিতে এবং এদের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণার সমন্বয়ে নির্ধারিত হচ্ছে। এই তিনটি দর্শনই কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না এবং এই তিনটি মতবাদই বলছে যে "আমাকে অনুসরণ কর, আমি তোমাদের সর্বোত্তম উৎপাদনশীলতার স্বর্গরাজ্যে পৌঁছিয়ে দেব।" কিন্তু এর কোনটিই এককভাবে বা যৌথভাবে উদ্দেশ্য সাধনে সম্পূর্ণ সার্থক হতে পারলো না। মোটিভেটর-হাইজিন থিওরিও একই দাবী করছে। এই মতবাদ কাজকর্মকে শুধুমাত্র র‍্যাশনালাইজ করতে চায় না। এই মতবাদ বিশ্বাস করে যে কাজকর্মগুলিকে মোটিভেটর উপাদানগুলোর সাহায্যে সমৃদ্ধ (enrich) করে তুলতে হবে এবং

একমাত্র এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।

অতএব নতুন যে পথ পাওয়া গেল তার নাম দেওয়া হলো 'job enrichment' বা কর্মের সমৃদ্ধিকরণ। দায়িত্ব, স্বীকৃতি, এ্যাচিভমেণ্ট, গ্রোথ ইত্যাদি মোটিভেটর উপাদানগুলোকে কাজকর্মের সঙ্গে অন্বিত করাই হচ্ছে 'জব্ এনরিচমেণ্টে'র উদ্দেশ্য। কীভাবে তা করা যায়? কখন তা করা উচিত? সংগঠনের কর্মপদ্ধতির কোন্ পর্যায়ে এই কর্ম সমৃদ্ধিকরণ নীতি সার্থকতা লাভ করবে?

কাজকর্মের ব্যাপারে কয়েকটি নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে যাতে মোটিভেটরগুলোকে প্রয়োগ করা যায়; যেমন—

নীতি	মোটিভেটরস্
১। দায়-দায়িত্ব বা এ্যাকাউণ্টাবিলিটি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ নিজের হাতে রেখে অধস্তন কর্মচারীদের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণের বিধি নিষেধ খানিকটা কমিয়ে নিতে পারেন।	১। দায়িত্ববোধ বা রেসপনসিবিলিটি এবং ব্যক্তিগত সার্থকতা বোধ।
২। কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে আপন কাজকর্মের জন্য দায়ভাগী করা।	২। দায়িত্ববোধ এবং স্বীকৃতি।
৩। একেকটি কর্মীকে একটি পূর্ণতর কর্মের দায়িত্ব দেওয়া।	৩। দায়িত্ব ও সার্থকতাবোধ এবং স্বীকৃতি।
৪। কর্মীকে কর্মের খানিকটা স্বাধীনতা দেওয়া অর্থাৎ নিজস্ব কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য আবশ্যকের অতিরিক্ত কর্তৃত্ব দেওয়া।	৪। দায়িত্ব ও সার্থকতাবোধ এবং স্বীকৃতি।
৫। কাজকর্মের ফলাফল সম্পর্কিত রিপোর্ট ইত্যাদি সরাসরিভাবে কর্মীকে জানিয়ে দেওয়া।	৫। স্বীকৃতি
৬। নূতন নূতন এবং কঠিনতর কর্মের সংস্থান ঘটানো।	৬। "গ্রোথ্" এবং শিক্ষা

এই যে নীতি এবং এই নীতির পিছনে যে মোটিভেটরগুলো রয়েছে তা

কোনও চরম কথা নয়। অর্থাৎ এর অতিরিক্ত আরও অনেক নীতি কাজ-কর্মের পর্যালোচনার ভিত্তিতে উদ্ভূত হতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে একটা সতর্কতা সর্বদা বজায় রাখতে হবে। দেখতে হবে যে মোটিভেটরের বদলে কোনও হাইজিন উপাদান ঢুকে না পড়ে। বস্তুতঃ হাইজিন এবং মোটিভেটর উপাদানে যে পার্থক্য তা অনেক সময়েই ধরতে পারা যায় না। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে এই যে প্রকৃত মোটিভেটর উপাদানের বদলে কোনও হাইজিন উপাদানে কাজকর্মের সমৃদ্ধিকরণ ঘটানো হলে, ইপ্সিত ফললাভ করা যাবে না। অর্থাৎ 'জব্ এনরিচমেণ্ট'র উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে এবং মোটিভেশন সুদূর পরাহত থাকবে।

"জব্ এনরিচমেণ্ট পলিসি" লোহা পেটানো শ্রমিক থেকে শুরু করে মাছি মারা কেরাণী পর্যন্ত যে কোনও পর্যায়ের কর্মীর কাজকর্মের ব্যাপারে প্রযুক্ত হতে পারে। কিছু কর্মী রয়েছে, কিছু কাজকর্মও রয়েছে। কাজকর্মগুলো ঠিকমত সমাধা হচ্ছে না। কর্মীকে পত্রপাঠ বিদায় দেওয়াই প্রথম কর্তব্য। কিন্তু নানাবিধ কারণে, যেমন সরকারী নীতি বা ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদির জন্য, কর্মীকে বিদায় দেওয়া যাচ্ছে না। অর্থাৎ এই কর্মীকে দিয়েই উক্ত কাজকর্মগুলো করাতে হবে এবং এই কর্মীদের কাছ থেকেই সর্বোত্তম কাজ আদায় করতে হবে। অসন্তোষ নিবৃত্তির উপাদানগুলো অর্থাৎ হাইজিন উপাদানসমূহ যথাযথভাবে প্রযুক্ত করা হলো। পার্সোনেল ম্যানেজমেণ্টের তিনটি প্রধান স্তম্ভ যার কথা আমরা আগেই বলেছি অর্থাৎ সংগঠন-তত্ত্ব, মানবিক ইঞ্জিনীয়ারিং এবং আচরণ বিজ্ঞান অনুযায়ী বিভিন্ন পলিসি নেওয়া হলো। এতেও যখন কিছু হলো না, তখন আসছে "জব এনরিচমেণ্ট" এর প্রশ্ন। কাজকর্মের পর্যালোচনা এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখা হলো যে কী ভাবে বিভিন্ন কাজকর্মকে মোটিভেটর উপাদানগুলোর সাহায্যে সমৃদ্ধ করে তোলা যায়। সংগঠনের যাবতীয় কর্মধারার মধ্য থেকে দু একটি কর্মধারা বেছে নিয়ে তাতে 'জব্ এনরিচমেণ্ট' এর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালানোই বাঞ্ছনীয়। 'জব্ এনরিচ-মেণ্ট' এর নামে শুধুমাত্র 'গ্রোথ', 'এ্যাচিভমেণ্ট' বা 'চ্যালেঞ্জ' ব'লে চেঁচালেই হবে না, এগুলোকে সত্য সত্যই কাজকর্মের সঙ্গে অন্বিত করতে হবে। এই অন্বয় যত সার্থক হবে, মোটিভেশনের সাধনও তত তাড়াতাড়ি এবং যথাযথ হবে।

অতএব মোটিভেশন বা স্ব-প্রণোদনা কিভাবে বাস্তবে সাধিত করা যায় তা আমরা এতক্ষণ দেখলাম। হাইজিন্ ও মোটিভেটরস্ উভয় প্রকারের উপাদানই এ প্রসংগে সমান গুরুত্বপূর্ণ। লোকে যদি খেতে পায়, তবেই শিক্ষা-দীক্ষা তথা কালচার ইত্যাদির কথা ভাবতে পারে, এবং পেট পুরে খেতে পেলেই 'not by bread alone' বলে এগুলোর কথা ভাববেই ভাববে। কাজেই হাইজিন ও মোটিভেটরস্ উভয়েই যেমন সমান গুরুত্বপূর্ণ তেমনি উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ সম্বন্ধযুক্তও বটে। কোন বিশেষ 'জব্'কে একবার সমৃদ্ধ বা enrich করে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও চলবে না। সমগ্র ব্যাপারটি একটি চলিষ্ণু ধারা বিশেষ—ক্রমান্বয়ে একের পর এক নতুন পলিসির সাহায্যে কর্মকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলতে হবে। হয়তো সকল কর্মকেই এন্‌রিচ করার পন্থা পদ্ধতি খুঁজে সময় ও অর্থ নষ্ট করতে হবে না—কয়েকটি বিশেষ 'কর্ম' সমৃদ্ধ হলেই সামগ্রিকভাবে মোটিভেশনের সমাগম ঘটবে কিন্তু কিছুটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে ফলাফলের জন্য—কেননা প্রকৃত মোটি-ভেশন কোন হুজুগের ব্যাপার নয়, এটা একটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

॥ ৬ ॥

মানবিক ইঞ্জিনীয়ারিং

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের আলোচনা প্রসংগে আমরা বলেছিলাম যে 'বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্ট' থেকে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানে বিবর্তন হালের ঘটনা। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের ধ্যান-ধারণাগুলোর কোনো মূল্যই নেই। বস্তুতঃ 'বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টে'র Time and motion study থেকে শুরু করে, মানবিক ইঞ্জিনীয়ারীং তথা আধুনিকতম 'হাইজিন্' উপাদানের ধারণা—এগুলো একই রকমের চিন্তা-ধারণার বিবর্তন ছাড়া আর কিছু নয়। এই ধারণাগুলোর পরিপূর্ণ ও সাফল্য-জনক প্রয়োগে যে কর্ম আবহ তথা পরিমণ্ডল সৃষ্ট হয় তা যে শুধু মানুষী শ্রমের সর্বাঙ্গসুন্দর ব্যবহারই নিশ্চিত করে তাই নয়, বহুবিধ অশান্তি, অসন্তোষ তথা অনীহারও দূরীকরণে প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে। এই পটভূমির পরিপ্রেক্ষিতেই স্ব-প্রণোদনার আবশ্যক উপাদানগুলো—যেগুলোকে আমরা 'মোটিভেটর' বলেছি, সেগুলো—সাফল্যজনকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধ মানুষ আপন প্রেরণায় কাজ করে। কিন্তু সেই কাজ যদি উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে পরিচালিত না হয়, তা হলে মানুষী শ্রমের সর্বোত্তম উপযোগ সম্ভব হয় না। অর্থাৎ মানুষী শ্রমের অপচয় কমানো এবং নিযুক্ত শ্রমের বিনিয়োগে সর্বোত্তম ফললাভ করতে হলে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুনির্দিষ্ট পন্থা-পদ্ধতি তথা কর্মপ্রবাহ একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় সম্পূর্ণ সদিচ্ছা এবং আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও বাঞ্ছিত ফললাভ হবে না।

কর্মচারীরা যে পন্থা-পদ্ধতিতে কর্মসম্পাদন করে সেই পদ্ধতির দোষগুণ, কার্যকারিতা বা অপকারিতা ইত্যাদি সম্বন্ধে না জানলে, সেই পদ্ধতির কি কি পরিবর্তন করা দরকার তা বোঝা যাবে না। কাজেই প্রথমে যে কাজটা করা উচিত তা হচ্ছে কর্ম ও কর্ম-পদ্ধতিকে ভালো করে পর্যালোচনা করা। এই উদ্দেশ্যে কোনো কর্মপদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যে প্রক্রিয়ায় যাচাই করে দেখা যেতে পারে সেই প্রক্রিয়াকে work study নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই 'ওয়ার্ক ষ্টাডি'কে আবার 'মেথড ষ্টাডি' ও 'কর্ম পরিমাপ' এই

দুইভাবে ভাগ করা যায়। এছাড়া আরও বহুবিধ আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন মনো-বিজ্ঞান, শিল্প মনোবিদ্যা, শারীর বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়রীং, এর্গোনমিক্স, সাইবার-নেটিক্স, শিল্প স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত।

যে কাজ করা হচ্ছে বা যে কাজে হাত দেওয়া হবে ভাবা হচ্ছে এই উভয়-ক্ষেত্রেই ওয়ার্ক ষ্টাডির প্রয়োগ করা যেতে পারে। যে কোন কর্ম বা কর্মপদ্ধতি যেখানে মানবিক শ্রমের প্রয়োজন রয়েছে, যেখানে মানুষের শ্রম প্রযুক্ত হতে পারে সেখানেই ওয়ার্ক-ষ্টাডির সাফল্যজনক প্রয়োগ হতে পারে। শুধুমাত্র ফ্যাক্টরী বা অফিস কাছারীতে নয় যেখানেই কোনো প্রকার মানুষী কর্মধারার অস্তিত্ব রয়েছে সেখানেই আমরা ওয়ার্ক-ষ্টাডি প্রয়োগে সেই কর্মধারার পুংখানু-পুংখরূপে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি এবং উক্ত কর্মধারার সর্বোত্তম পদ্ধতি খুঁজে বের করতে পারি।

কোনও কর্মপদ্ধতির এই যে পুংখানুপুংখ বিচার বিশ্লেষণ একেই 'মেথড ষ্টাডি' বলা হয়েছে। A. E. E. টেক্‌নিকে [Analysis, Evaluation, Evo-lution] মেথড্ ষ্টাডি তার লক্ষ্যে পৌছোয়। বিচার্য কর্মধারা বা কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যাদি সংগৃহীত ও সংকলিত করে সেগুলোকে আনুষংগিক তাবৎ বিষয় তথা জ্ঞান বিজ্ঞানের নিরিখে প্রথমে বিচার করা করা হল। তার-পর এরই ভিত্তিতে, যে জ্ঞানলাভ করা গেল তাকে পরিপ্রেক্ষিত রেখে সর্বোৎকৃষ্ট কর্মধারার রূপ ও রেখা নির্দিষ্ট করার যে পদ্ধতি তাকেই এককথায় মেথড ষ্টাডি বলা হয়। ব্যাপারটা অত্যন্ত সাদামাটা বা সহজ-সরল শোনালেও আসলে এত সহজ নয়। সময়ে সময়ে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলায় মেথড-ষ্টাডির এই সরল প্রক্রিয়াও এমন জটিল আকার ধারণ করতে পারে যে তাবৎ বিশেষজ্ঞবৃন্দের পক্ষেও অথৈ জলে হাবুডুবু খাওয়ার অবস্থা হয়।

যে কর্মপদ্ধতিকে অনুশীলন করতে হবে প্রথমেই দেখতে হবে যে সংগঠনের বৃহৎ উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে তার ভূমিকা কতখানি। এই ভূমিকার সম্পাদনে যে পরিমাণ অর্থ, সম্পদ বা সময় লাগছে তারও একটা মূল্যায়ণ করে নিতে হবে। এবারে প্রচলিত ধ্যানধারণা তথা জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে উক্ত পদ্ধতিকে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুনির্দিষ্ট করতে হবে। এভাবে যদি বিশ্লেষণে এগোন যায় তাহলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার শুধু যে নিশ্চিত হবে তাই নয় সংগে সংগে সংগঠনের বৃহৎ উদ্দেশ্য বা কর্মপদ্ধতির ভূমিকা উভয়ই কিছুটা

বাঞ্ছিত পরিবর্তন লাভে সক্ষম হবে। বিভিন্ন ধ্যানধারণার আলোকে কোন পদ্ধতির এই যে বিশ্লেষণ কর্ম—এই ব্যাপারটা কিন্তু মেথড ষ্টাডির নিজস্ব ভাষায় বা নিজস্ব আংগিকে সমাধা করতে হবে, অর্থাৎ মেথড্-ষ্টাডি বা ওয়ার্ক-ষ্টাডির নিজস্ব ভাষা তথা নিজস্ব প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন তথ্যাদি যদি সংকলিত ও সন্নিবেশিত না করা যায় তাহলে এই বিশ্লেষণ কর্ম ঠিকমত করা যাবে না। মেথড-ষ্টাডির নিজস্ব কিছু সিম্বল বা চিহ্ন রয়েছে—এই চিহ্নগুলোকেই আমরা মেথড্ ষ্টাডির নিজস্ব ভাষা বলতে পারি। যেমন—

Operation
বা বিশেষ কোন কর্ম-অনুষ্ঠান O

Inspection
বা নিরীক্ষণ/পরিদর্শন □

Transport
বা যানবাহনের মাধ্যমে যোগ →

Delay
বা সময়ের বিস্তৃতি D

Storage
বা সংরক্ষণ ▽

যে পদ্ধতিকে অনুশীলন বা পর্যবেক্ষণ করতে হবে সেই পদ্ধতির সংগে সংশ্লিষ্ট সর্বপ্রকার কর্ম বা তথ্যাদি এই চিহ্নগুলোর সাহায্যে কিছু চার্ট বা গ্রাফের মাধ্যমে সন্নিবেশিত করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ম্যানেজমেণ্টের তিন প্রবক্তা যথাক্রমে টেলর, গ্যাণ্ট ও গিলবার্থ—এই ত্রয়ীই বেশীরভাগ চার্টের উদ্ভব ঘটিয়ে গেছেন। বিভিন্ন জাতের তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন প্রকার চার্টের ব্যবস্থা রয়েছে। ব্যাকগ্রাউণ্ড ডাটা, যে কোনও প্রোসেস বা মেথড—সবই গ্রাফ তথা চার্টের মাধ্যমে দেখানো যেতে পারে। 'প্রোসেস' এর অর্থ হচ্ছে সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে পদার্থ বা অ-মানবিক যে কোনও সম্পদের ক্রমান্বয়িক ব্যবহার সূচিত হয়। মেথড হচ্ছে সেই পদ্ধতি যেখানে মানুষের কর্ম বা activity বস্তুর সংগে বা স্ব-নির্ভরভাবে দেখানো যায়। প্রোসেস্ বা মেথড সবই চার্টের মাধ্যমে আমরা দেখতে পারি। কিছু চার্ট আমরা নিম্নলিখিতভাবে অভিহিত করতে পারি। যেমন—

OPC—Outline Process Chart

সাধারণভাবে সর্বাঙ্গীণ প্রোসেস্‌টিকে প্রধান প্রধান কার্যসহ দেখানো যায়।

FPC-Mat—Flow Process Chart—Material

উৎপন্ন বস্তু বা ব্যবহৃত উপাদানসমূহের ক্রমান্বয়ী প্রয়োগ দেখায়।

FPC-Man—Flow Process Chart—Man

উৎপাদন কর্মে নিযুক্ত মানুষের কর্মধারার প্রয়োগ দেখায়।

FPC-Comb—Flow Process Chart—Combined

কোনও কর্মে নিযুক্ত মানুষের শ্রম ও বস্তুর একত্রে ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখায়।

THPC—Two Handed Process Chart

কর্মে নিযুক্ত মানুষের উভয় হস্তের কাজ ক্রমান্বয়ী শৃঙ্খলায় বিবৃত করে।

MAC—Multiple Activity Chart

একই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের কাজকর্ম ও বস্তুর ব্যবহার বিভিন্ন সম্পর্কিত কর্মধারার আংগিকে দেখায়।

SMCC—Simultaneous Motion Cycle Chart

একই কর্মে এবং একই সময়ের বিচারে মানুষের বিভিন্ন অংগ-প্রত্যংগের ব্যবহার দেখায়।

MMC—Men's Motion Chart

একেক দল কর্মীর দীর্ঘতর সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালিক ও ক্রমান্বয়ী কর্ম দেখায়।

এ সমস্ত চার্ট ছাড়াও আরো বহুবিধ চার্ট হতে পারে এবং শুধু দ্বিমাত্রিক নয় ত্রিমাত্রিক চার্টও হতে পারে। শুধু প্রোসেস বা মেথডই নয়, যে কোনও রকমের মোশন্ বা মুভমেণ্টও চার্টের মাধ্যমে দেখানো যায়। এইরূপ বিভিন্ন ধরণের চার্টের ব্যবস্থাবিধি দেওয়া থাকলেও সব চার্টই যে মেথড-ষ্টাডিতে প্রয়োজনীয়—তেমন নয়। যে পদ্ধতির বিচার-বিবেচনার জন্য 'মেথড-ষ্টাডি' প্রযুক্ত হচ্ছে সেই পদ্ধতির উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনই উপযুক্ত চার্টের নির্বাচন ও নির্ধারণ করবে। বিভিন্ন ধরণের চার্টের ব্যবস্থা থাকলেও—যিনি মেথড-ষ্টাডি

তথা ওয়ার্ক-ষ্টাডি বিশেষজ্ঞ—তাঁকেই বেছে নিতে হবে তাঁর কাজের পক্ষে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় চার্টসমূহকে। যে কাজে স্ক্রু-ড্রাইভার লাগবে সে কাজে রেঞ্জ লাগালে মোটেই চলবে না এবং যে কাজে একটা কোদালই যথেষ্ট সে কাজে যদি একটা ট্র্যাক্টর লাগানো যায় তাহলে কাজটা যেমন বাধাপ্রাপ্ত হবে ঠিক তেমনি খরচের মাত্রাও অসম্ভবহারে বেড়ে যাবে।

যে পদ্ধতিতে মানুষী শ্রম কর্মে ব্যবহৃত হবে সেই পদ্ধতির বিজ্ঞানসম্মত পারম্পর্য ও যৌক্তিকতা বিচারই ওয়ার্ক-ষ্টাডি তথা মেথড-ষ্টাডির উদ্দেশ্য। আমরা আগেই বলেছি যে ওয়ার্ক-ষ্টাডিকে দুভাবে ভাগ করা যায়—মেথড ষ্টাডি ও আনুষংগিক বিষয়সমূহ। মেথড ষ্টাডি শুধু কর্মপদ্ধতিরই আলোচনা করে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কাজকর্মের আবহ তথা কর্মপরিমণ্ডলের কথাও ভাবা দরকার। আনুষংগিক বিষয় প্রসংগে আমরা এর আগে Ergonomics কথাটার উল্লেখ করেছিলাম। Ergonomics কথাটা গ্রীক শব্দ 'Ergon', যার অর্থ কাজ এবং Nomes, যার অর্থ নিয়মকানুন—এই শব্দদুটো থেকেই উৎপত্তি-লাভ করেছে। তাই বাংলায় যদি আমরা এর্গোনমিক্সকে 'কাজের আইন' বলে অভিহিত করি তাহলে বোধহয় খুব একটা ভুল হয় না। কিন্তু এর দ্বারা এর্গোনমিক্সের ধারণার খুব একটা কিছু প্রকাশ হয় না। এর্গোনমিক্সকে আমরা মানবিক ইঞ্জিনীয়ারীং বা শিল্প-মনোবিদ্যা ইত্যাদি অ্যাখ্যায়ও অভিহিত করতে পারি—কিন্তু তাহলেও ধারণাটা পুরোপুরি প্রকাশিত হয় না। আসলে এ কথাটাই নতুন—এর বক্তব্যবিষয় ও প্রকার-প্রকরণ অনেকাংশই পূর্বাবধি চলে আসছে। মনোবিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা, যন্ত্রবিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতির সংগে সংগেএই সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের বহুবিধ ধ্যানধারণাকে একত্র সংবদ্ধ করে একটা সাধারণ তত্ত্বের ছত্র ছায়ায় নিয়ে এসে এই নতুন শাস্ত্র—'এর্গোনমিক্সের' উদ্ভব হয়েছে। ILO অর্থাৎ আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা এর্গোনমিক্সের সংজ্ঞা এইভাবে দিয়েছেন—The application of biological sciences in conjuntion with engineering sciences to the worker and his working environments so as to obtain maximum satisfaction for the worker which at the same time enhances Productivity.

উৎপাদনকার্যে যন্ত্রপাতি বা মেশিনারি ব্যবহার যত বাড়ছে, উৎপন্ন সামগ্রীর পরিমাণ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন পদ্ধতি এবং উৎপাদন

ব্যবস্থারও আমূল পরিবর্তন ঘটছে। মেশিনের আকার ও আয়তন ক্রমাগতই পরিবর্তন লাভ করছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই জটিলতর যান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপাদনকর্মে অনুপ্রবেশ ঘটছে। ফলতঃ মেশিন-মানুষ সম্পর্কও জটিলাকার ধারণ করছে। মেশিন-মানুষ সম্পর্ক অনুধাবন করতে হলে যন্ত্রবিদ্যা-শরীর-বিজ্ঞান-মনোবিদ্যা ইত্যাদি জ্ঞান বিজ্ঞানের সাহায্য অবশ্যই নিতে হবে। শুধু ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানেই নয় আজকাল সর্বক্ষেত্রেই বহুবিধ জ্ঞানবিজ্ঞানের একত্র ব্যবহার হচ্ছে। যেমন চিকিৎসাবিদ্যার কথা ধরা যাক। কারুর পায়ের হাড় সরে গেলে বা ভেঙ্গে গেলে ঠিক করে দেওয়ার জন্য ডাক্তারকেই ডাকা হয়। বর্তমানে বড় বড় হাসপাতালে অস্থিবিদ্যায় সহায়তা করার জন্য ইঞ্জিনীয়ারও নিযুক্ত থাকে। এদের কাজ হচ্ছে হাড় ঠিক করে বসানোর ব্যাপারে ডাক্তারকে পরামর্শ দেওয়া। ঠিক তেমনি ইঞ্জিনীয়ারিংএর ক্ষেত্রেও মেশিন পত্রাদির ডিজাইন করার সময় শরীর বিজ্ঞানীদের মতামত নেওয়া হচ্ছে। বস্তুতঃ মানুষের শরীর প্রকৃতির যান্ত্রিক জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা। প্যারিসের 'আইফিল টাওয়ার' যন্ত্রবিজ্ঞানের অন্যতম বিস্ময়। কিন্তু বর্তমানে যখন দেখা গেল যে মানুষের পায়ে যে কটা হাড়ের উপর পুরো শরীরটা যে মূলনীতিতে দাঁড়িয়ে থাকে ঠিক সেই নীতিতেই 'আইফিল টাওয়ার' আজও দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমাদের বিস্ময় আর বাঁধ মানেনা। প্রাণীজগৎ থেকে যন্ত্রের ডিজাইনের অনুপ্রেরণা পাওয়া আজ আর কোনও নতুন কথা নয়—এরোপ্লেন, সাবমেরিন থেকে শুরু করে ক্ষুদ্রতম যন্ত্রপাতিও প্রাণীর শরীর সংগঠনের মূলনীতি অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে। তাই মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতির সঙ্গে মানুষ নামক যন্ত্রের নীতিগত এবং ব্যবহারগত সমন্বয় না থাকলে মানুষের দ্বারা যন্ত্রপাতি ব্যবহার আশানুরূপ ফলপ্রদ হবে না।

মেশিনের একটা হ্যাণ্ডেল ঠিক কোন্ জায়গায় বসালে লোকের পরিশ্রম কম হবে, মেশিনটা কত উঁচু হবে, লম্বা কতটা হবে, ইত্যাদির ব্যাপারে কোনও মেশিন ডিজাইনের সময় অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। মেশিনটা যেখানে বসবে সেখানে কতটা জায়গা থাকা দরকার, সেখানে আলো-বাতাস-উত্তাপ কতটা থাকবে, শব্দ কত জোরেহবে বা হওয়া উচিত ইত্যাদি, এমন কি সেখানকার দেওয়ালের রঙ কী হবে এইসব নানারকম বিষয় ভাববার রয়েছে শুধুমাত্র ফ্যাক্টরীতেই নয়, এমন কী অফিস কাছারীতেও, অর্থাৎ যেখানেই

কোনও মানুষকে কাজকর্ম করতে হবে সেখানেই এই বিষয়গুলো নিয়ে ভাববার আবশ্যকতা রয়েছে। মানুষের শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার সঙ্গে তাল রেখে মানুষের শ্রমের বিনিয়োগ যদি হয়, তবেই মানুষের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ পাওয়া যাবে। 'এর্গোনমিক্স'—এই ব্যাপারেই আলোচনা করে।

কিছু 'ইন্‌পুট' বা উপাদানকে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় প্রোসেস্ করলে ফল হিসাবে কিছু দ্রব্য উৎপন্ন বা কিছু সেবা উৎসৃত হয়। উপাদান থেকে উৎপন্ন সামগ্রী—এই যে পরিবর্তন বা বিবর্তন এই ব্যাপারটা উৎপাদন পদ্ধতির সাহায্যে উৎপাদন কর্মের দ্বারাই হয়। মানুষই উৎপাদন কর্মের প্রধান হোতা, কেননা মানুষের শ্রম ছাড়া কখনও কোনও উৎপাদন হতে পারে না। ম্যানেজার থেকে শুরু করে পিওন চাপরাশী পর্যন্ত সকল নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের শ্রমই উৎপাদন পদ্ধতির প্রাণ। এই শ্রমের যথাযথ ও সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগই ম্যানেজারের আদর্শ ও লক্ষ্য। কায়িক ও মানসিক উভয় প্রকারের শ্রমই সমান গুরুত্বপূর্ণ। উৎপাদন পদ্ধতি যেহেতু একটা চলিষ্ণু এবং সতত প্রবহমান ধারা-বিশেষ সেজন্য দীর্ঘ সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কারুর কাজই ফেলে দেওয়ার মত নয়—প্রত্যেকের কাজকর্মই আপন আপন ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বিভিন্ন স্তর ও পর্য্যায়ে নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের বয়স, যোগ্যতা, ট্রেনিং, অভিজ্ঞতা, কাজকর্মের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য, কর্মপরিবেশ, কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি নিযুক্ত কর্মী ও তার জন্য নির্দিষ্ট কর্মের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। এর্গোনমিক্স কর্মীবৃন্দের সংগে সম্পৃক্ত কর্মসংক্রান্ত এই বিষয়গুলোই আলোচনা করে। আরেকটু বিশদভাবে বলা যেতে পারে পরবর্তী পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছকের মাধ্যমে ঃ

কর্মীবৃন্দ ও কর্মসংক্রান্ত ছকের বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে পর্য্যালোচনা করার প্রয়োজন রয়েছে। এর্গোনমিক্স এই ব্যাপারেই আলোচনা করে।

কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ীই কর্মী নির্বাচন করতে হবে। যে কাজকর্মের জন্য কর্মীর প্রয়োজন সেই বিশেষ কাজকর্মের বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব অনুযায়ী কর্মী বাছাই করা দরকার। যে কাজ একজন সামান্য শিক্ষিত লোকের দ্বারা হবে সে কাজে একজন উচ্চশিক্ষিত লোক লাগালে তাতে অকাজই বেশী হবে। কিন্তু যে সংগঠনে প্রমোশন পদ্ধতি খুব ভালো এবং একদম নিচুস্তর থেকে উচ্চতর স্তরে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রমোশন খুব তাড়াতাড়ি ঘটতে পারে সেখানে উচ্চতর যোগ্যতা-সম্পন্ন কর্মী নিয়োগ করলে খুব একটা
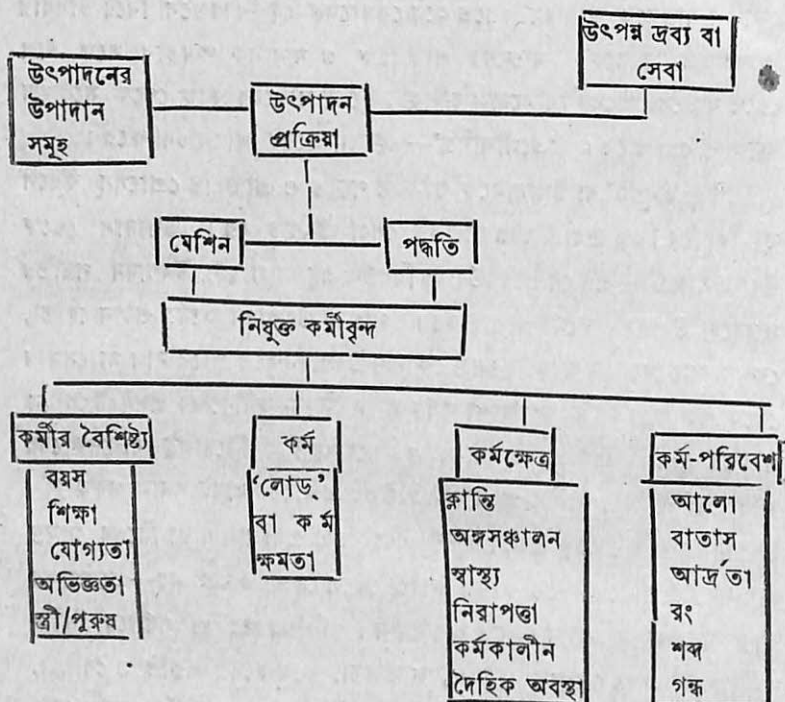
অসুবিধে হয় না। বরং কিছুটা সুবিধেই ঘটে থাকে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মী গ্রহণ করা হবে না কর্ম সম্পাদন করতে করতে কর্মীদের অভিজ্ঞ করে তোলা হবে, এ ব্যাপারটাও ভেবে দেখতে হবে। যে কর্মীকে দিয়ে কাজ করাতে হবে সেই কর্মীর বয়স, শিক্ষা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং sex (স্ত্রী না পুরুষ) ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্ম ও কর্মী উভয়েই পরস্পর সাপেক্ষ এবং উভয়ের যৌথ মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার ভিত্তিতেই এই ব্যাপারে নীতিগ্রহণ করতে হবে। কর্ম অনুযায়ী না হয় কর্মীকে বাছাই করা হল কিন্তু তারপর ক্রমশঃ কর্মীকে কতটা কর্মের সংগে জড়িত হতে হবে এবং কর্মকে কতটা কর্মী-সাপেক্ষ করে তুলতে হবে তাও ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। সংগঠনের উদ্দেশ্য, উৎপাদন পদ্ধতির চাহিদা এবং ম্যানেজারের উপলব্ধি—এগুলোই কর্ম ও কর্মীর পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাত নির্ধারণ করে দেবে।

প্রত্যেক মানুষেরই কর্মক্ষমতার একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। প্রাকৃতিক কারণে মানুষের পরিশ্রম করার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। মানসিক ও শারীরিক

উভয় প্রকার পরিশ্রম করার যে ক্ষমতা তাকে 'লোড' (Load) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। এই 'লোড' বা ভারের ধারণা শারীরিক বা মানসিক উভয় প্রকার শ্রমেই প্রযোজ্য। কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী লোডকে স্থিতিশীল এবং গতিশীল এই দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মনে করা যাক কোনও শ্রমিক মাথায় করে মালপত্র আনা নেয়া করে। এখানে লোড গতিশীল। কিন্তু যে কর্মসম্পাদনে গতির প্রয়োজন হয় না সেখানে স্থিতিশীল বা স্থানু লোড কর্মীদের উপর চাপানো হয়। মানসিক লোড দু ধরণের হয়—ইন্দ্রিয়গত ও চিন্তাগত। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে যে অনুভব করার ক্ষমতা কোনও কর্ম সম্পাদনে এই ক্ষমতা ব্যবহারের দরকার হলে তবেই সংশ্লিষ্ট কর্মীর উপর ইন্দ্রিয়গত অনুভবের 'লোড' চাপানো হয়। এই ইন্দ্রিয়গত 'লোড' আবার কর্মের গতিশীলতার ভিত্তিতে স্থানু বা গতিশীল —দুইই হতে পারে। মোটর গাড়ির ড্রাইভারের পক্ষে ট্রাফিক লাইট গতিশীল লোড ; কিন্তু ড্যাস্‌বোর্ডের স্পীডোমিটার স্থানু বা স্থিতিশীল লোড। এটা যেমন চক্ষু ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার, ঠিক তেমনি শব্দ বা আওয়াজ শোনার জন্য কান, গন্ধ শোঁকার জন্য নাক, স্বাদ বোঝার জন্য জিহ্বা আর স্পর্শগত অনুভবের জন্য ত্বক ইন্দ্রিয়ের উপর কাজের লোড বা চাপ পড়ে। এ তো গেল ইন্দ্রিয়গত মানসিক লোডের কথা। চিন্তাগত মানসিক লোডও স্থিতিশীল এবং গতিশীল—এ দুই রকমের হতে পারে। কোনও ধারণা স্মৃতিতে রেখে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী—যেমন যেমন সমস্যা উদ্ভূত হচ্ছে তেমন তেমন সমস্যা সমাধানে মাথা খাটানোকে স্থিতিশীল মানসিক লোড বলা যায়। আর নূতন চিন্তা-ভাবনা তথা নূতন পন্থা-পদ্ধতি বা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনকে গতিশীল মানসিক লোড বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

সকল কর্মীর উপর যে সর্ব প্রকার 'লোড' সমান ভাবে পড়বে তার কোনও বাধ্য-বাধকতা নেই। কর্মের প্রকৃতি অনুযায়ী কাউকে বেশী শারীরিক, কাউকে বা বেশী মানসিক, আবার কাউকে বা সমান সমান শারীরিক ও মানসিক 'লোড' বইতে হয়। কতটা 'লোড' মানুষ বইতে পারে এবং কী ভাবে 'লোড'কে বিন্যস্ত করলে মানুষের পরিশ্রম কম হয় এ ব্যাপারে শরীর বিদ্যার সাহায্য নিতে হবে। এ বিষয়ে গবেষণা এখনও চলছে, কিন্তু যতদূর পর্যন্ত জানা বা বোঝা গেছে তার ভিত্তিতেই কাজকর্মের 'লোড' বিন্যাস করতে হবে।

মানুষের মস্তিষ্ক হচ্ছে সকল চালনা-ভাবনা তথা মননের মূল কেন্দ্র। ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে মস্তিষ্ক অভিজ্ঞতা, জ্ঞান তথা পরিচয় সংগ্রহ করে। বস্তু-জগৎ সম্বন্ধে মানুষের সকল জ্ঞান বস্তুজগৎ থেকেই এসেছে এবং এর প্রাথমিক সংগ্রাহক হচ্ছে গ্রহীতা 'নার্ভ' তথা ইন্দ্রিয়সমূহ। এই জ্ঞান মস্তিষ্কে সঞ্চিত হচ্ছে, ক্রমার্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বিশ্লেষিত হচ্ছে এবং এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নতুন ধ্যান-ধারণা তথা জ্ঞানের সৃষ্টি করছে। এমনকি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে যে সমস্ত কাজকর্ম হচ্ছে তাও প্রধানতঃ মস্তিষ্কের নির্দেশে হচ্ছে। ফলতঃ যে কোনও শারীরিক কাজকর্ম তথা 'লোড' নির্বাহ করতে শুধু যে শারীরিক শ্রমই লাগছে তা নয় মানসিক শ্রমও হচ্ছে।

অবশ্য কোনও শারীরিক কর্মে শরীর বিশেষভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে তাতে মানসিক শ্রম খুব কম লাগে। অতএব শারীরিক ও মানসিক শ্রম উভয়ের আদর্শ ভারসাম্য ঘটানোই লোড বিন্যাসের লক্ষ্য।

শারীরিক শ্রম কমাতে হবে যাতে শ্রমিকের ক্লান্তি কম হয়। ক্লান্তি ব্যাপারটা আসলে কী? মাংসপেশীর শক্তি যত তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়, তার চেয়ে অনেক কম সময়ে মানুষের গ্রহীতা নার্ভসমূহ—যেগুলো ইন্দ্রিয়সমূহের প্রাণ—ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কাজেই ক্লান্তি আসলে নার্ভের তথা ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার। তাই কর্মসমূহের এমন বিন্যাস প্রয়োজন, যাতে ইন্দ্রিয়গুলো আপন সামর্থের মধ্যে কাজ করতে পারে। অর্থাৎ কাজকর্মগুলোকে ইন্দ্রিয়ের লোডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। এ ব্যাপারে একটি ইন্দ্রিয়ই আবার সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই ইন্দ্রিয়টি হচ্ছে চক্ষু। মানুষ যত কাজকর্ম করে তার বেশীর ভাগই দেখার মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। মনে করা যাক একজন মোটর গাড়ীর ড্রাইভার রাস্তা দিয়ে গাড়ী চালাচ্ছে। সে যখন গাড়ী চালায় তখন প্রধানতঃ দেখার মাধ্যমেই তার ইন্দ্রিয় স্থানু ও পরিবর্তনশীল বাস্তব তথ্যাদি সংগৃহীত করে মস্তিষ্কে পাঠায়। মস্তিষ্ক পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সঞ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে ইন্দ্রিয় সমূহকে নির্দেশ পাঠায়। ফলতঃ ড্রাইভারের হাত পা কাজ করে, গাড়ী চলে, থামে এবং আবার চলতে থাকে। দেখা এবং দেখে উপলব্ধি করার মাধ্যমেই গাড়ী চালানো কাজটি নিষ্পন্ন হ'ল।

সাইনবোর্ড, আলোক-সংকেত তথা বিভিন্ন ধরণের মিটার নানারকম

কাজে ব্যবহৃত হয়। অক্ষরগুলো কত বড় হবে, কি রংয়ের হবে, কতদূরে বসানো হবে, কি রকম type-এ বা প্যাটার্ণে অক্ষরগুলো থাকবে, কি রংয়ের আলো হবে, আলোর কতটা ঔজ্জ্বল্য থাকবে, মিটারের সাইজ বা আকার কি রকম হবে (গোল, চৌকো ইত্যাদি) এই সব ব্যাপারে বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব সম্মত চিন্তার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এগুলো যদি যথাযথ হয় তবেই 'লোডের' চাপ কম পড়বে। গ্রহীতা নার্ভ, পেশীর শক্তি ও মস্তিষ্কের কার্যকরী ক্ষমতার সুচারু বিন্যাসের উপর নির্ভর করেই শারীরিক ও মানসিক লোড সংস্থাপন করতে হবে।

কণ্ট্রোল মেকানিজম ও পদ্ধতিও সহজ এবং সরল করে তোলা আবশ্যক। আমাদের পূর্বের উদাহরণে ড্রাইভারের হাতের ষ্টীয়ারীং হচ্ছে কণ্ট্রোল মেকানিজম্। এর সাহায্যেই ড্রাইভার ডাইনে, বামে বা সোজা গাড়ী চালাতে সক্ষম হচ্ছে। মেশিনপত্রের জন্য মেকানিক্যাল, ইলেকট্রিক্যাল বা ইলেকট্রনিক কণ্ট্রোল ব্যবস্থা থাকতে পারে। যে কয়েকটা হ্যাণ্ডেল দিয়ে মেশিনটিকে চালু ও কার্যকরী রাখতে হবে সেই হ্যাণ্ডেলগুলো যেন হাতের বা পায়ের কাছে সুবিধেমত থাকে। একটা কণ্ট্রোল প্যানেল বা বোর্ডে অসংখ্য রকমের সুইচ ও মিটার থাকতে পারে। কিন্তু সেগুলোর অবস্থান ও আকৃতি অবশ্যই বিজ্ঞানসম্মত ভাবে নির্ধারিত হতে হবে। কণ্ট্রোল ব্যবস্থা স্থির করার সময় যেমন মেশিন ও তার কাজকর্মের কথা ভাবতে হবে ঠিক তেমনি যে মানুষের দ্বারা কণ্ট্রোল ব্যবস্থা কার্যকরী হবে সেই মানুষের শারীরিক-মানসিক ক্ষমতার কথাও সমান গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে। একটা কণ্ট্রোল প্যানেল বা বোর্ডে যদি অসংখ্য ও বহুবিধ ধরণের সুইচ ও মিটার থাকে তাহলে যে কর্মীকে তার পরিচালনা করতে হবে তিনি যে শুধু সেগুলোর ব্যাপারে ওয়াকিবহাল থাকবেন তাই নয়, সুইচ ও মিটারগুলোর অবস্থিতি যেন তার আয়ত্তাধীন থাকে, বিপরীত কর্মধারা নিয়ামক সুইচগুলো যেন এত কাছাকাছি না থাকে যাতে একটু ভুলে কোন সাংঘাতিক বিপর্য্যয় ঘটে যায়। মোটর গাড়ীর ড্রাইভারের ক্ষেত্রে ব্যাক্ গিয়ার আর টপ গিয়ারের অবস্থিতির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। এরোপ্লেনের ক্ষেত্রে ল্যাণ্ডিং গিয়ার আর উইং ফ্ল্যাপের কথা বলা যায়। প্লেন টেক অফ করার সময় একটা উঠবে অপরটা নামবে অথচ প্লেন ল্যাণ্ড করার সময় ঠিক বিপরীতভাবে একটা নামবে অপরটা

উঠবে। এই দুটোর কণ্ট্রোল মেকানিজমের পাশাপাশি অবস্থানের ফলে পূর্বে অনেক দুর্ঘটনা ঘটেছে। আসল কথাটা হচ্ছে এই যে মেশিনপত্রাদি ডিজাইনের সময় শুধু মেশিন ও তার চাহিদার কথা ভাবলেই চলবে না। যে মানুষ সেই মেশিন চালাবে তার দক্ষতা, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতা, সুবিধা-অসুবিধা— এগুলোর কথাও সমান গুরুত্ব সহকারে ভাবতে হবে।

লোডকে কর্ম ক্লান্তিকর করে তুলতে হলে লোড কমাতে হবে। কিভাবে কাজকর্ম ঠিক রেখে লোড কমানো যায়? শাররিক অংগ প্রত্যংগ সমূহের নাড়াচাড়ার মাধ্যমেই মানুষ দৈহিক শ্রম বিনিয়োগ করে। এখন অনাবশ্যক নড়া-চড়া যদি কমানো যায়, কর্মসম্পাদন করার সময় দাঁড়ানো বা বসার জন্ত সহজ ও স্বাস্থ্যসম্মত পদ্ধতি নেওয়া যায়, তাহলে মানুষের উপর কাজের 'ভার' তথা চাপ কম পড়ে এবং কর্মীমানুষ খুব তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে না।

ফ্যাক্টরী, অফিস ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই অর্থাৎ যেখানে কোন মানুষ কাজ করে বা কোন মানুষকে দিয়ে করানো হয় সেখানেই 'লোড' বিন্যাস এইসব কথা ভেবে করতে হবে। যে টেবিলে কাজ করতে হয় সেটা চৌকোণা না হয়ে গোল বা অর্ধ-গোলাকার হলে এবং দুহাতের আয়ত্তাধীন পরিধি পর্যন্ত বিস্তৃত হলে টেবিলের ওপরে যে কাজকর্ম তা আয়ত্তাধীন থাকে এবং কম নড়াচড়া করে সম্পন্ন করা যায়। অফিস টেবিলের কোথায় টেলিফোন, কোথায় কলম-টলম, কোথায় কাগজ পত্রাদি থাকবে এগুলো বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যসম্মত ভাবে নির্ধারিত করতে হবে। শুধু তাই নয় অফিস-কাছারীতে কাজকর্মের ব্যবস্থাপনায়ও এর্গোনমিক্স সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। টেবিল চেয়ারের মাপ যেমন শরীর বিন্যাসম্মত হওয়া উচিত তেমনি টাইপ করা, টেলিফোন PBX চালানো ইত্যাদি যাবতীয় শারীরিক কর্মাদি ন্যূনতম অংগ সংচালনের ভিত্তিতে সংগঠিত করতে হবে। অফিসের কাজকর্মের নিয়মকানুন ও পদ্ধতিও 'ওয়ার্ক-ষ্টাডির' প্রয়োগে বিজ্ঞান সম্মতভাবে নির্ধারিত করার সুযোগ রয়েছে। এমন কি অফিসের কাজকর্মে যে বিভিন্নপ্রকার 'ফর্ম' ব্যবহৃত হয় তার প্রকার প্রকরণ নিয়েও যথেষ্ট চিন্তাভাবনার সুযোগ রয়েছে। বস্তুতঃ কর্ম কেমন হওয়া উচিত এই নিয়েই একখানা আস্ত বই লেখা চলে।

কলকারখানায়ও ঠিক তেমনি একদিকে কাজের প্রকৃতি এবং অন্যদিকে কম অঙ্গ সঞ্চালন কম 'লোড' চাপানো এবং কম দূরত্বের মধ্যে কর্ম সংস্থাপন

ইত্যাদি নীতির ভিত্তিতে ওয়ার্ক-বেঞ্চের আকার নির্ধারণ করতে হবে। মানুষের এক হাত বা এক পা যদি কাজ করে এবং অন্য হাত বা অন্য পা যদি কর্মে নিযুক্ত না থাকে তাহলে মানুষ শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অতএব মেশিন পত্রাদির ডিজাইন এমন ভাবে করতে হবে, যাতে মানুষের উভয় হাত বা উভয় পা অথবা হাত এবং পা একসাথে কর্মে নিযুক্ত থাকে। কিন্তু যে কাজ করা হবে তাতে দু হাতের বা দু পায়ের একই ধরণের গতি থাকবে—এক হাত যদি বাঁ দিকে ঘোরে অন্য হাত ডান দিকে ঘুরবে না। একই ধরণের একই রকমের এবং একই গতিতে অংগ সঞ্চালন ক্রমাগত অবিচ্ছিন্নভাবে যদি চলতে থাকে তা হলে তা স্বাভাবিক হয়ে মানুষের অভ্যাসে পরিবর্তিত হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের কাজকর্ম তার অভ্যাসের অঙ্গীভূত না হচ্ছে ততক্ষণ মানুষের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ আদায় করা যায় না। কাজকর্মের গতি ও ছন্দ যদি অবিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে চলে এবং কোথাও কোন বাধা না পায় বা কোথাও তালভংগ না হয় তাহলে কাজকর্মের চাপ অনেক কম পড়ে। টানা রিক্সাওয়ালা একটু টানের পর মোমেণ্টামের সাহায্য পায়। বারবার যদি তাকে রাস্তায় থামতে হয় তাহলে সে অতি শীঘ্র ক্লান্ত হয়ে পড়বে। কামার শালায় কামারের হাতুড়ি বারবার একই জায়গায় পড়ে—কেননা একই গতিতে একই ছন্দে খানিকক্ষণ কাজটা চলে। এই ছন্দ বা তাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মানুষের অংগ-সংচালনের বা বসা-দাঁড়ানো-দৌড়ানোর যে সহজ ও স্বাভাবিক অবস্থা রয়েছে তাকে বজায় রেখেই কাজের ছন্দ বা rhythm গড়ে ওঠে। 'মারো জোয়ান—হেইয়ো' বলে তাল দিয়ে দিয়ে যে শারীরিক কাজকর্ম আমরা শ্রমিকদের করতে দেখি তা এই কর্মের স্বাভাবিক ছন্দের জরুণই গড়ে ওঠে। অতএব এই কথাগুলো মনে রেখেই মানুষের কাছ থেকে সর্বোত্তম কাজ আদায়ে এগোতে হবে। "মোশন ষ্টাডি" মানুষের হাত-পা ইত্যাদি অংগের সংচালন সম্বন্ধে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে। আমরা যে হাত পা নাড়াচাড়া করি তা কয়েকটা কেন্দ্র বা pivot এর ভিত্তিতেই করে থাকি। শরীরের বিভিন্ন অংশ যথা—কনুই, কব্জী, হাঁটু, কাঁধ, উরুসন্ধি ইত্যাদি এই pivot এর কাজ করে। হাত বা পায়ের নাড়াচাড়ার মাধ্যমেই আমরা জগতের যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকি। কিন্তু হাত বা পায়ের এই সঞ্চালন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের অংগ সঞ্চালনে শরীরের

বিভিন্ন pivot গুলো বিভিন্নভাবে কাজ করে। শক্তি ও সামর্থ্যের ব্যয়সংক্ষেপ করতে হলে এই pivot বা কেন্দ্রগুলো সম্বন্ধে শুধু যে জানতে হবে তাই নয়, এই কেন্দ্রগুলোর ব্যবহারে শক্তির কতটা ব্যয় হয় সে সম্বন্ধেও জানতে হবে এবং তদনুযায়ী কাজকর্মের সংস্থান ঘটাতে হবে।

কর্মস্থলে কর্মীদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সুরক্ষিত করতে হবে। এ ব্যাপারে আইন-কানুনের নির্দেশ আমাদের দেশে শুধু নয়, সব দেশেই রয়েছে। এ ব্যাপারে ম্যানেজারের কর্তব্য শুধু আইনের নির্দেশ মানাই নয়, এই দুটো ব্যাপার যে সত্যই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় তা উপলব্ধি করার প্রয়োজন রয়েছে। শ্রমিক কর্মচারীদের দোষ দেবার আগে ম্যানেজারদের একথা অবশ্যই ভেবে দেখা উচিত যে তারা শ্রমিক-কর্মচারী সম্বন্ধে, তাদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্বন্ধে কতটা ভাবছেন, বিজ্ঞানসম্মতভাবে কতটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করেছেন কিনা।

যেখানে মানুষ কাজ করবে সেখানকার পরিবেশ ও কাজের পদ্ধতি যে মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল করে তুলতেই হবে তা বলা বাহুল্য। জল, আলো, বাতাস, আর্দ্রতা, শুষ্কতা ইত্যাদি সবকিছুরই ভূমিকা এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আজকাল অনেক মেশিনপত্র তৈরী হচ্ছে যেগুলোকে একটা নিয়ন্ত্রিত ও নির্ধারিত তাপমাত্রার মধ্যে রাখতে হয়। মানুষের শরীর নামক এই যন্ত্রের জন্য এক আদর্শ ও অনুকূল পরিবেশ আরও বেশী জরুরী। বস্তুতঃ এই ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি আমরা উপলব্ধি করতে পারব ততই মঙ্গল। মানুষের মনের চাহিদা এবং অনুভূতির তৃপ্তি যেন কর্ম পরিবেশের মধ্যে ঘটতে পারে। শব্দ-আলো-গন্ধ এবং দৃশ্যের এ ব্যাপারে অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা রয়েছে। দেওয়ালে এমন রং লাগানো যেতে পারে যাতে মানুষের মনে শৈত্যানুভূতি জেগে ওঠে, আবার এমন রংও রয়েছে যা মানুষের মনে উষ্ণতার অনুভূতি জাগিয়ে তুলবে। এ নিয়ে বিস্তর গবেষণা হয়েছে। বস্তুতঃ প্রতিকূল পরিবেশে মনের অনুকূল অনুভূতির উদ্দীপক রংয়ের সমাবেশ ঘটিয়ে মানুষের মানসিক অনুভূতি ও প্রণোদনা অনেকাংশে প্রভাবিত করা যায় এবং ফলতঃ পরিবেশের দুর্বিষহতা মানুষের কাছে অনেকটা সহনীয় হয়ে ওঠে। যে কর্ম পরিবেশে গরম অত্যন্ত বেশি সেখানে শীতের অনুভূতি জাগায় এমন রং ব্যবহার করলে কর্মীদের গরম যদিও কম লাগবে

না, তবুও গরমের অনুভূতি কিছুটা কম হবে। ঠিক তেমনি শ্রুতিসুখকর শব্দ বা সংগীত এবং মনোহর গন্ধাদির সংস্থান ঘটিয়ে মানুষের মন ও অনুভূতির উপর অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করা যায়। মানুষের কর্মপরিবেশকে গবেষণালব্ধ এইরূপ জ্ঞান ও ধারণার মাধ্যমেই মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির অনুকূল করে তুলতে হবে। এর ফলে শুধু যে শ্রমিক কর্মচারীর কর্মজনিত ক্লান্তি কম হবে তাই নয় মানুষের উৎপাদনশীলতারও সর্বোত্তম বিকাশ ঘটবে। ‘এর্গোনমিক্স’ এ সমস্ত বিষয়গুলো আলোচনা করে। ম্যানেজারের পক্ষে তাই এর্গোনমিক্সের জ্ঞান ও ধ্যানধারণাসমূহের প্রতি নিষ্ঠা থাকা একান্ত আবশ্যক।

কর্মী নির্বাচন, কর্ম-পরিবেশ এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে এই যে আলোচনা আমরা এতক্ষণ করলাম তা শুধুমাত্র পরিচায়িকা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিভিন্ন ধ্যান ধারণার বিশ্লেষণ তো দূরের কথা, শুধুমাত্র পরিচয়ও পুরোপুরি দেওয়া যায় নি। ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানের পরিধি যে কত বিশাল তা এর দ্বারা কিছুটা অনুমান করা যায়।

॥ ৭ ॥

বিভিন্ন ম্যানেজমেণ্ট টেক্‌নিক্‌স্‌

ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞান প্রসংগে আমরা কিছু কিছু টেকনিকের নাম প্রায়ই শুনে থাকি। এই ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে আমরা বেশীরভাগ লোকেরা বিশেষ কিছু জানি না। অথচ পত্র-পত্রিকার দৌলতে এই নামগুলোর বিশেষ মর্যাদা ও কৌলিন্য সম্বন্ধে আমাদের একটা অস্পষ্ট ধারণা যে না জন্মায় তা নয়। এই অধ্যায়ে আমরা কয়েকটি ম্যানেজমেণ্ট টেক্‌নিক্ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাতের চেষ্টা করব।

ওয়ার্ক ষ্টাডি ও মেথড্ ষ্টাডির কথা আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করেছি। কিন্তু এ ছাড়াও আরও অনেক নাম শোনা যায়। যেমন—PERT, CPM, OR, MBO, MBE, সিষ্টেম অ্যানালাইসিস্, ষ্ট্যাটিস্টিক্যাল কোয়ালিটি কণ্ট্রোল, ইন্‌পুট-আউটপুট অ্যানালাইসিস্, সিম্যুলেশন্, MIS, EDP ইত্যাদি। পত্র-পত্রিকাদির দৌলতে এই কথাগুলো আজ আর কারুর অজানা নয়। কিন্তু আমরা বেশীরভাগ লোকই এ বিষয়গুলোর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানি না। অবশ্য এ জন্য লজ্জিত হওয়ারও কিছু নেই। এমন কি বিভিন্ন বড় বড় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তথাকথিত ম্যানেজারদেরও সব ব্যাপারে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান নেই। অবশ্য তার কোন প্রয়োজনও নেই। ম্যানেজারকে সর্বশাস্ত্র বিশারদ করে তোলা যায় না। দরকার হচ্ছে বিভিন্ন শাস্ত্র ও জ্ঞানবিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্যকরী ধারণার—যদি তা থাকে তবেই কার্যক্ষেত্রে এই সমস্ত টেক্‌নিকের প্রয়োগ করার সদিচ্ছা থাকবে। ধারণা যত সুদৃঢ় হবে ধারণাসমূহের ব্যবহারিক প্রয়োগে সাফল্য অর্জনের প্রত্যয়ও তত বলিষ্ঠ হবে। এই প্রত্যয়ই টেক্‌নিক্‌সমূহের বাস্তবিক প্রয়োগে ম্যানেজারকে বাধ্য করাবে।

ম্যানেজমেণ্ট বিদ্যা যারা রীতিমত অধ্যয়ন করেন তাদের সর্ববিদ্যায়ই শিক্ষিত করে তোলার চেষ্টা হয়। কিন্তু অঙ্ক, পরিসংখ্যানশাস্ত্র, যন্ত্রগণক এমনকি ম্যানেজমেণ্ট ইনফর্মেশন সিষ্টেম পর্যন্ত বহুবিধ বিষয় 'বিশেষজ্ঞদের' এক্তিয়ারভুক্ত। শুনতে আশ্চর্য লাগলেও একথা সত্য যে আজকের এ বিশেষজ্ঞ ও বিশেষায়নের যুগে 'ম্যানেজার' পর্যন্ত জেনারেলিষ্ট হয়ে পড়েছেন

এবং তাকে তার কর্ম্মনির্বাহে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিতে হচ্ছে। OR বিশেষজ্ঞ, সিষ্টেম এ্যানালিষ্ট বা যন্ত্রগণক বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারের কাজকর্মে সহায়তা করছেন, কিন্তু তার আগে বিভিন্ন বিজ্ঞান সম্বন্ধে ম্যানেজারকে জানতে হবে, বিভিন্ন টেক্‌নিকের মাধ্যমে কি কি কাজ কিভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে অবহিত হ'তে হবে। অন্যথায় ঠিক সময়ে ঠিক কাজের কাজীকে ডাকা যাবে না। ফলতঃ ম্যানেজাররা নিজেরা বিভিন্ন টেক্‌নিক সম্বন্ধে আদ্যোপান্ত না জেনেও কার্য্যক্ষেত্রে টেক্‌নিক্‌গুলোর ব্যবহার করেন, বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে এক্সপার্টদের ডাকেন এবং তাদের সাহায্য নিয়ে কর্মসমাধা করে থাকেন।

ম্যানেজারদের নিজেদেরই যখন এই অবস্থা তখন সাধারণ লোকের তো কথাই নেই। বস্তুতঃ একেকটা টেক্‌নিক্‌ই একেকটি শাস্ত্র বিশেষ। সেজন্য এখানে আমরা কয়েকটা টেক্‌নিকের পরিচয় মাত্র নেওয়ার চেষ্টা করব। যেখানে একেকটা টেক্‌নিক্‌ পিছু কয়েক গণ্ডা বই লেখা যেতে পারে সেখানে স্বল্প পরিসরে বিশেষ কিছু আলোচনার সুযোগ নেই। এখানে আমরা সংক্ষেপে ব্যাপারটা কি শুধু তাই জানার চেষ্টা করব।

প্রত্যেক শাস্ত্র তথা কাজকর্ম্মের নিজস্ব আঙ্গিক রয়েছে। অতএব ম্যানেজমেণ্ট শাস্ত্রেরও স্বাভাবিকভাবেই নিজস্ব প্রকার-প্রকরণ তথা স্বকীয় কর্মভঙ্গিমা রয়েছে। এরই ভিত্তিতে বিভিন্ন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাসমূহকে একত্র সন্নিবেশিত করে বিভিন্ন ম্যানেজমেণ্ট টেক্‌নিক্‌গুলো গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটা টেক্‌নিক্‌ নতুন 'ডিসিপ্লিন্‌' বা 'বিদ্যা' হিসেবে পরিগণিত হবার মত পর্যায়ে পৌছে গিয়েছে। তথ্যাদির সংকলন, বিচার-বিশ্লেষণ এবং উপস্থাপনের পদ্ধতির মাধ্যমে এই টেক্‌নিক্‌গুলো বিভিন্ন সমস্যার উপলব্ধির পক্ষেই শুধু সহায়তা করে না, বস্তুতঃ বিজ্ঞানসম্মত ও সর্বোত্তম ডিসিশন্‌ নিতে ম্যানেজারকে সাহায্য করে বলেই এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম।

নেট্‌-ওয়ার্ক অ্যানালাইসিস্‌

রাস্তা তৈরী করা, বাঁধ নির্মাণ করা বা বিরাট কোন ফ্যাক্টরী সংস্থাপন করার মত কাজকে প্রজেক্ট বলা হয়। এই প্রজেক্ট রূপায়ণের দায়িত্ব যদি কোন ম্যানেজারের উপর ন্যস্ত করা যায় তাহলে সর্বপ্রথমেই দেখা যাবে যে বিভিন্ন পরস্পর সাপেক্ষ এবং পরস্পর নিরপেক্ষ কর্মধারার সময়মত ও যথাযথ

পূর্তির মাধ্যমেই এই প্রজেক্টটি সার্থকভাবে রূপায়িত হতে পারে. বিভিন্ন কর্মধারার মধ্যে কোনো একটি বা বিশেষ কয়েকটি কর্মধারা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে থাকতে পারে। এগুলোকে যদি ঠিকমত নিয়ন্ত্রিত না করা যায় তাহলে প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করতে শুধু যে বেশী সময়ই লাগবে তাই নয়, বেশী অর্থেরও প্রয়োজন হয়। যত সময় বেশী লাগবে, অর্থও তত বেশী লাগবে এবং ফলতঃ বাজেটে টান পড়বে। বাজেটের অর্থের সীমা যতই পার হয়ে যাবে প্রজেক্টটি ততই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সময় এবং অর্থের যেখানে টান রয়েছে সেই সমস্ত প্রজেক্টে নেট্ ওয়ার্ক অ্যানালাইসিস্ সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে।

কোনো একটি প্রজেক্ট কর্মে রূপায়িত করতে হলে তিনটি বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে ম্যানেজারকে এগুতে হয়। এগুলো হচ্ছে যথাক্রমে Planning বা পরিকল্পনা, Scheduling বা কালানুক্রমণ স্থিরীকরণ এবং Control বা নিয়ন্ত্রণ। পরিকল্পনা পর্যায়ে ম্যানেজার বিভিন্ন প্রধান কর্মধারা ও উপকর্মধারা নির্ধারিত করে নিয়ে পূর্বাপর পারম্পর্য স্থির করেন। অর্থাৎ কোন্ কোন্ কাজ আগে করতে হবে, কোন্ কাজগুলো বিশেষ বিশেষ কয়েকটা কাজকর্ম না হওয়া পর্যন্ত করা যাবে না—এই ব্যাপারগুলো ম্যানেজার নির্ধারিত করেন এবং প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে সহজবোধ্যভাবে লিপিবদ্ধ করেন। Scheduling পর্যায়ে ম্যানেজার সময় ও অন্যান্য প্রতিবন্ধকের কথা বিবেচনা ক'রে বিভিন্ন কর্মধারার কালক্রম স্থির করেন। কোনও কাজকর্ম করতে যে সময় লাগে তা যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য কাঁচা মাল, যা ঐ কর্মটি নিষ্পন্ন করতে দরকার হয়, তার সময়মত ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্তির ওপর অনেকাংশে নির্ভর করে। অর্থাৎ যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল যদি সময়মত না পাওয়া যায় এবং যতটা দরকার ততটা পরিমাণে না পাওয়া যায় তাহলে কাজটি শেষ করতে অনেক দেরী হয়ে যাবে। যন্ত্রপাতি ও মালমশলার যোগান বহুবিধ কারণের ওপর নির্ভর করে। ম্যানেজারকে এই সমস্ত কারণের কথা বিবেচনা করে সময়সীমা নির্ধারিত করতে হয়। এবারে কণ্ট্রোল পর্যায়। এই পর্যায়ে ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে কর্মধারা নিয়ন্ত্রণ করা। যে সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে, ম্যানেজারকে দেখতে হবে যে সেই সময়-সারণী অনুযায়ী বিভিন্ন কর্মধারা এগিয়ে চলেছে। নানা কারণে, নানা প্রয়োজনে এর মধ্যে বিভিন্ন সংশোধন ও পরিবর্তনের

প্রয়োজন হতে পারে। অতএব এই পর্যায়ে ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে নির্ধারিত সময়সূচী যাতে ব্যাহত না হয়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা। নেট্‌ওয়ার্ক এ্যানালাইসিস্ এই তিনটি পর্যায়ের মাধ্যমে ম্যানেজারের কাজকর্মের সহায়তা করে।

সামরিক ও শিল্প সংক্রান্ত—উভয় দিকেই গবেষণা করতে করতে ১৯৫৭/৫৮ সাল নাগাদ এই টেকনিকের উদ্ভব হয়। বস্তুতঃ আমরা 'নেটওয়ার্ক' বলতে যা বোঝাতে চাইছি তা আসলে একটা সামগ্রিক ধারণা। নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো এই সামগ্রিক ধারণার অন্তর্ভুক্ত—

যেমন,

CPM বা Critical Path Method.

PERT বা Programme Evaluation and Review Technique.

PERT/Cost বা Programme Evaluation and Review Technique incorporating Cost.

LES বা Least-cost Estimating and Scheduling.

SCANS বা Scheduling and Controlling by Automatic Network System.

এই পদ্ধতিগুলোর নিজেদের মধ্যে অল্পবিস্তর যে পার্থক্য নেই এমন নয়, কিন্তু মূলতঃ এগুলো সবই একই গোষ্ঠীর অন্তর্গত।

স্বল্প পরিসরে 'নেট ওয়ার্ক' ব্যাপারটা বোঝা সহজ ব্যাপার নয়। তবুও একটা ছোট উদাহরণ নিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

A—আপনি সেলুনে গিয়ে চেয়ারে বসলেন।

B—চুল কাটালেন।

C—দাড়ি কাটালেন।

D—চেয়ার ছেড়ে উঠলেন।

অর্থাৎ সেলুনে গিয়ে চুল দাড়ি কেটে আসা কর্মটাকে এইভাবে ভাগ করে দেখানো হলো। এই ব্যাপারটাকেই রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখান যায়।

পরপৃষ্ঠার রেখাচিত্র বা চার্টকেই 'নেট ওয়ার্ক' বলা হয়। গোল চিহ্নটাকে 'Node' বলে। এর দ্বারা কোনও একটা 'Event' বা ঘটনা সংগঠন বোঝানো
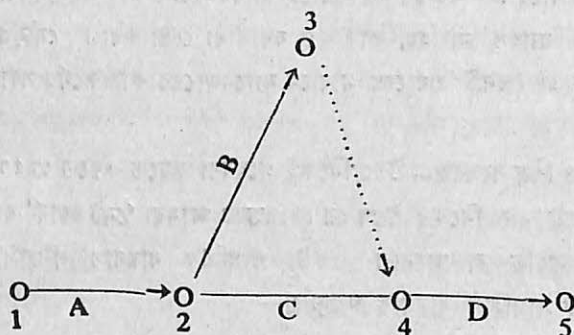
যায়। তীর চিহ্ন দ্বারা 'Job' বা কর্মধারা সূচিত করা হয়। চুল কাটা বা দাড়ি কাটা ব্যাপারটা সম্পন্ন করতে হলে কাজটা শুরু এবং শেষ দুটোই করতে হয়। এই যে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কর্মধারা তা কিছুটা সময় নেয় এবং একেই 'Job' বলে অভিহিত করা হয়। 'নোড্'গুলো যার দ্বারা 'ইভেণ্ট' বোঝানো হয় তা হচ্ছে কর্মধারার ফলস্বরূপ। সেজন্যই তীরচিহ্নগুলো 'নোডে' গিয়ে সমাপ্তি লাভ করেছে। একটার পর একটা এই ক্রমান্বয়ে একের পর এক কাজ করলে এই 'নোড' গুলোকে 1, 2, 3,……ইত্যাদি সংখ্যার সাহায্যে চিহ্নিত করা হয়।

কোনও নির্দিষ্ট কর্মধারা যে সময় নেয় সেটা তীরচিহ্নের পাশাপাশি ব্র্যাকেটে করে সূচিত করা যায়। কোনও কাজ করতে গেলে, কিছু যন্ত্রপাতি, লোক লস্কর, টাকাপয়সা ইত্যাদিও লাগে। সেগুলোও এখানে দেখানো যেতে পারে।

একটা 'ডামি' তীরচিহ্ন যা আমাদের ওপরের এই নেটওয়ার্কে 'ডটেড' লাইনে দেখানো হয়েছে তা কোনও কর্মধারা নয়। এতে কোনও সময় বা অর্থ লাগে না। এর সাহায্যে দুটো পৃথক কর্মধারাকে পৃথক ভাবে দেখানো যেতে পারে। আমাদের আলোচ্য উদাহরণে চুল কাটানো ও দাড়ি কাটানো —এই দুটো কর্মধারা এর সাহায্যে পৃথক করা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই কর্মধারার ফলস্বরূপ যে দুটো 'ইভেণ্ট' বা ঘটনা ঘটছে সে দুটো সম্পূর্ণ আলাদা। কিন্তু এই দুটো ঘটনা ঘটার পরেই আপনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

এইভাবে চার্ট বা 'নেটওয়ার্ক' তৈরী করা গেল। এবারে বিচার করে দেখতে হবে যে কোন্ কাজটা বা কোন্ কর্মধারাগুলো আসল। অর্থাৎ কোন্ কর্মধারা বা কর্মধারাগুলো ঐ প্রজেক্টের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্তির পক্ষে অত্যন্ত জরুরী। সময়, যন্ত্রপাতি, লোকজন ও টাকাপয়সার বিচারে প্রত্যেক কর্মধারার নিজস্ব প্রয়োজনগুলো বিচার করে দেখা হল এবং একত্রে চার্টের মধ্যে সন্নিবেশিত করা হল। বিভিন্ন কাজগুলো নিষ্পন্ন করতে যে সময় লাগছে তার আলাদা আলাদা বিচার করা হল। দেখা গেল যে কিছু কিছু কাজ এককভাবে নিষ্পন্ন করতে যে সময় লাগে, পুরো প্রজেক্টটা শেষ করতে যে সময় লাগে তার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার তুলনায়, সেই সময় অনেক কম। ফলতঃ কিছুটা সময় হাতে থাকে অর্থাৎ বেঁচে যায়। ধরা যাক গঙ্গানদীর ওপর দিয়ে কোলকাতায় দ্বিতীয় সেতুটি তৈরী হবে। সেতুর ছধারে অ্যাপ্রোচ রোড্ তৈরী করতে হবে। যে যে স্তম্ভের ওপর সেতুটি দাঁড়াবে সেই স্তম্ভগুলোর নির্মাণ এবং স্থাপনা করতে হবে। তারপর সেতুটি পুরোপুরি তৈরী হলে সেতুটির সামগ্রিক নির্মাণ কর্ম সম্পন্ন হল বলে ধরা যেতে পারে। এখন ছদিকের রাস্তার কাজ শেষ হয়ে গেলেই পুরো প্রজেক্টটার কাজ শেষ হয় না। সেইরূপ সেতুর স্তম্ভগুলোর নির্মাণ কার্য শেষ হয়ে গেলেই সেতুটি পুরোপুরি শেষ হয় না। যে প্রজেক্টটি হাতে নেওয়া হয়েছে তার সকল বিভাগের সর্বপ্রকার কাজকর্ম যদি এক সাথে হাতে নেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময়সূচীর মধ্যে যদি প্রজেক্টটি সম্পূর্ণ করার বাধ্যবাধকতা থাকে তাহলে এই যে বাড়তি সময়টা হাতে পাওয়া যায় সেটা খুব মূল্যবান। কোনো 'ইভেণ্টের' ব্যাপারে এই হিসেবটা বের করলে তাকে বলা হয় Slack, আর কোনো 'জব' এর ব্যাপারে এই বাড়তি সময়টাকে বলা হয় Float। সমগ্র নেটওয়ার্কের মধ্যে গ্রথিত বিভিন্ন কর্মধারাসমূহকে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে কিছু বা কোন একটি কর্মধারায় এই Float একেবারেই পাওয়া যায় না। এই Float ছাড়া কর্মধারাকেই Critical Path বলা হয়। খুব কম Float রয়েছে এমন কিছু কর্মধারাও থাকতে পারে। এগুলোকে Sub-critical Path বলা হয়। ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে এই ক্রিটিক্যাল পথ খুঁজে বের করে তার ওপর নিজের দৃষ্টি রাখা যাতে ওই প্রজেক্টটি সময়মত সমাধা হয়। প্রজেক্টটির যিনি প্রধান কর্ম-নির্বাহক বা ম্যানেজার তিনি সকল কাজকর্মের

উপর নজর দিতে কখনও পারবেন না, কেননা একার পক্ষে সবকিছু দেখাশোনা বা যাবতীয় কর্মধারাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। অতএব সবচেয়ে জরুরী যে কাজকর্মগুলো তার ওপরে ম্যানেজার যদি নজর রাখেন তাহলে বোধহয় গুরুত্ব ও দায়িত্বের যোগ্য বণ্টন হয়। ক্রিটিক্যাল পথ বা পথসমূহ বের করা হল, ম্যানেজার সেগুলো নিজের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে না হয় পরিচালনাও করল। কিন্তু এরপর ম্যানেজার কি করবে—ক্রিটিক্যাল কর্মধারাসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে করতে ম্যানেজার কিভাবে অন্যান্য কর্মধারা তথা সামগ্রিকভাবে প্রজেক্টটির পরিচালনা করবেন ?

ইংরাজীতে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—**Plan the work and work out the plan**। এরই অঙ্গ হিসেবে ম্যানেজার 'ক্র্যাশিং'এর সাহায্য নিতে পারেন। Crashing এর অর্থ হচ্ছে কোনো বিশেষ কর্মধারায় অর্থ ও অন্যান্য সামর্থ্য বেশী করে নিয়োগ করা যাতে ঐ কর্মধারাটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা আগেই নিষ্পন্ন হয়। এজন্য ম্যানেজার হয়তো **Float** বেশী রয়েছে এমন কর্মধারার জন্য বরাদ্দ বা এমন কর্মধারাতে নিযুক্ত কিছু যন্ত্রপাতি বা লোকজন তুলে নিয়ে সংকটময় বা প্রায় সংকটময় কোনো কর্মধারায় লাগাতে পারেন।

ফলতঃ দেখা যায় যে নেট-ওয়ার্কের মাধ্যমে কাজকর্ম করলে, ম্যানেজার একদিকে যেমন কাজ শুরু করার আগেই ভবিষ্যৎ বাধা বিপত্তিসমূহ অনেকাংশ জানতে পারেন অপরদিকে তেমনি তাঁর পক্ষে সেই বাধা বিপত্তিগুলো দূর করে সময়মত কাজটা নিষ্পন্ন করার চেষ্টা নেওয়াও সহজসাধ্য হয়। যন্ত্রপাতি, লোকজন, কাঁচামাল ইত্যাদির সঙ্গে সময়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতির মাধ্যমেই ম্যানেজার নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কর্তব্যকর্ম নিষ্পন্ন করতে এগিয়ে যান। বিভিন্ন পর্যায়ে ও বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সহজ হয়। ঠিক কোন্ পর্যায়ে বা ঠিক কোন্ মুহূর্তে কোন্ জিনিসের দরকার হবে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে ম্যানেজার তা আগে থেকেই উপলব্ধি করতে পারেন এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারেন। ক্রিটিক্যাল বা প্রায়-ক্রিটিক্যাল কর্মধারাগুলো ম্যানেজার নিজের হাতে রেখে অন্যান্য কর্মধারাগুলো অধঃস্তন বা বিভাগীয় ম্যানেজারদের হাতে ন্যস্ত করতে পারেন। অর্থাৎ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্মধারাগুলো নিজের হাতে রেখে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজকর্মগুলো বিভিন্ন সহকারীবৃন্দের মধ্যে ম্যানেজার সুনির্দিষ্ট

দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যের শৃঙ্খলায় ন্যস্ত করতে পারেন। এই সমস্ত কর্মধারার প্রত্যেকটির জন্য আবার পূর্বে আলোচিত 'ওয়ার্ক-ষ্টাডি' তথা 'মেথড-ষ্টাডি'র ব্যবস্থা করা যেতে পারে। 'ওয়ার্ক-ষ্টাডি'র প্রয়োগে বিভিন্ন কর্মধারাগুলোর সব চেয়ে কম সময়ে সর্বোত্তম কর্মপূর্ত্তি সম্ভব হতে পারে।

অপারেশন্‌স্‌ রিসার্চ বা O.R. (Operations Research)

বিজ্ঞানসম্মত পন্থা-পদ্ধতির মাধ্যমে কোনও কর্মধারা বা কর্মপদ্ধতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে সর্বোত্তম প্রক্রিয়ার সাহায্যে সেই কর্ম সম্পাদন করা—সাধারণ ভাবে "অপারেশন্‌স্‌ রিসার্চ"-এর সংজ্ঞা আমরা এইভাবেই দিতে পারি। কোনও কর্মে বিভিন্ন ধরনের যত "অপারেশন্‌স্‌" লাগে তার প্রত্যেকটিকে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলন ও পর্যালোচনা করা হয় বলেই এর নাম "অপারেশন্‌স্‌ রিসার্চ" দেওয়া হয়েছে। যে বিশিষ্ট জ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা তথা অবধারণের মাধ্যমে কতকগুলো নিয়ত সূত্রের আকারে আবদ্ধ করা যায় তাকে আমরা সাধারণভাবে বিজ্ঞান বলতে পারি। অপারেশনগুলোর বিশ্লেষণে এই বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানেরই প্রয়োগ করতে হবে, অন্যথায় এই বিশ্লেষণ ব্যাপারটি ঠিকমত হবে না। বস্তুতঃ অপারেশনগুলো একের পর এক যেমন যেমন নিষ্পন্ন করতে হবে ঠিক তেমনি একই সাথে উদ্ভূত সমস্যাদির সমাধানও করতে হবে। যে কাজকর্ম চলছে, যে পন্থা-পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে অপারেশনস রিসার্চ বিশ্লেষণ বা OR বিশেষজ্ঞ তারই বিচার-বিবেচনা সাপেক্ষে উন্নততর পন্থা-পদ্ধতি বাত্‌লে দেন। আপনি ম্যানেজার। আপনি কাজকর্ম সম্পাদনের পন্থা-পদ্ধতির নিয়ামক। আপনার ওপরে বাইরের আরেকজন এসে মাতব্বরি করবে তা বেশীর ভাগ সময়েই আপনার কাছে অসহ্য। ফলতঃ OR বিশেষজ্ঞের সাথে বাস্তবের ম্যানেজারের কিছু দ্বন্দ্ব রয়েছে। ম্যানেজারকে একথা উপলব্ধি করতে হবে যে OR বিশেষজ্ঞ ম্যানেজারকে সাহায্য করার জন্য, কাজকর্মের উন্নতি সাধনের জন্যই তাঁর জ্ঞানের প্রয়োগ করেন। বর্তমানবাদীদের সঙ্গে ভবিষ্যৎদ্রষ্টাদের বিরোধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় স্বতঃসিদ্ধতার পর্যায়ে পৌঁচেছে। তবুও একথা মনে রাখতে হবে যে এই বিরোধ অনেকাংশে ব্যক্তিসাপেক্ষ এবং তাই পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই এই বিরোধ সহনশীল করে নিয়ে

পরিবর্তনের চাকা এগিয়ে নেওয়া যায়। ফলতঃ OR বিশেষজ্ঞকেও মানব চরিত্রের এই দিকটার দিকে সজ্ঞান দৃষ্টি রেখে এগুতে হবে।

সে না হয় হ'ল। কিন্তু OR বিশেষজ্ঞ কিভাবে কাজকর্ম করেন? কি কি নূতন তত্ত্ব এই বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত বা এই বিজ্ঞানের প্রকার প্রকরণ কিরূপ? যদি আমরা বলি কমনসেন্সের ব্যবহারই এই বিজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য তাহলে হয়তো বহুলাংশে ঠিকই বলা হবে। কিন্তু একথা শুনে অনেকেই হেসে উঠ্‌বেন। বিজ্ঞান কি শুধুই কমন্‌সেন্স? গণিত শাস্ত্র এবং পরিসংখ্যান (Mathematics and Statistics)—এই দুই শাস্ত্রের মাধ্যমে কমনসেন্সের যুক্তিসিদ্ধ ব্যবহারই কিন্তু এই বিজ্ঞানের উপজীব্য। যদি প্রচলিত জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে কমনসেন্সের ব্যবহার করা যায় তবে কমনসেন্স ও বিজ্ঞানের পার্থক্য অনেকাংশেই কমে যায় এবং ব্যবহারিক কাজকর্মে বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার প্রয়োগ অত্যন্ত সহজ ও সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে।

'নেট্ ওয়ার্কের' মত এ ধারারও উদ্ভব তথা উন্নতি সামরিক প্রয়োজনেই সম্ভব হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় গ্রেট বৃটেনে প্লেন থেকে সাবমেরিনে বোমা ফেলে ধ্বংস করার এক অপারেশন্যাল্ সমস্যা দেখা দিল। বোমাগুলো ঠিক সময়ে ঠিক স্থানে না পড়লে সাবমেরিনগুলো ধ্বংস হয় না। এই সমস্যার সমাধান করতে গিয়েই ডিসিশন্ নেবার সহায়ক এই নূতন বিজ্ঞানের উদ্ভব হল। বস্তুতঃ নেট ওয়ার্কও এক হিসেবে OR এর সামগ্রিক ধারণার অন্তর্ভুক্ত। শুধুমাত্র উৎপাদন কর্মেই নয়, জগতের নানাবিধ কাজকর্মেই বিরাট সংখ্যক সংখ্যার ব্যবহার হয়। যেমন অনেক জিনিসপত্র, অনেক উৎপন্ন সামগ্রী, অনেক লোকজন, অনেক অপারেশন, অনেক পন্থা-পদ্ধতি ইত্যাদি। সামগ্রিকভাবে অঙ্কশাস্ত্র ও পরিসংখ্যানতত্ত্বের বিভিন্ন সূত্রের সাহায্যে এই সংখ্যা-সমূহকে বিবেচনা করা যায় অর্থাৎ একটা সুনির্দিষ্ট দৃঢ়সংবদ্ধ ধারণায় পৌছানো যায়। এই ধারণাকে যদি কার্যকরীভাবে কর্মে প্রযুক্ত করতে হয় বা এই সংখ্যাসমূহের আলোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণে লব্ধ জ্ঞানকে যদি উৎপাদন বা অন্য কোন কর্মে লাগাতে হয় তাহলে এই সংখ্যাগুলো এবং তার থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিকে ম্যানেজেব্‌লভাবে সাজাতে হবে। পরিসংখ্যান-বিজ্ঞান এই কাজের মস্ত সহায়। বিভিন্ন গড়ের হিসেব থেকে শুরু করে সম্ভাবনাতত্ত্ব বা Proba-bilityT heory পর্যন্ত পরিসংখ্যানের যাবতীয় সূত্রাদি শুধু যে বিরাট বিরাট

সংখ্যাকে সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে বেঁধে দেয় তাই নয়, বিরাট বিরাট সংখ্যার সমাবেশের পেছনেও যে নির্দিষ্ট নিয়মকানুন কাজ করছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ফলতঃ পরিসংখ্যান ও গাণিতিক তত্ত্বাদির ভিত্তিতে বিভিন্ন টেক্‌নিক্ বা পদ্ধতির আবির্ভাব হল। যেমন—

Linear Programming (LP)
Theory of Games
Queuing Theory
Theory of Simulation ইত্যাদি।

এই জাতীয় টেকনিকগুলোকে নিয়েই অপারেশনস্ রিসার্চ বা O. R.।

লিনীয়ার প্রোগ্রামিং—কিছু ইনপুট বা উপাদানের প্রয়োগে যে উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া যায় তার আনুপাতিক সম্বন্ধ যদি প্রথম ডিগ্রী বা একঘাত সমীকরণের সহজ মাত্রায় সংবদ্ধ করা যায় তাহলে উৎপাদন-ব্যাপারে যে কোন ডিসিশন নিতে লিনীয়ার প্রোগ্রামিং পদ্ধতির ব্যবহার করা যায়। জগতের বেশীর ভাগ সমস্যার বেশীর ভাগ অংশই একঘাত সমীকরণের সহজ আনু-পাতিক সম্বন্ধ মেনে চলে এবং সেজন্য এই লিনীয়ার প্রোগ্রামিং পদ্ধতি এই সমস্ত সমস্যার সমাধানে সহজভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। এমন কি যন্ত্রগণক বা কম্পিউটার পর্যন্ত এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরিচালিত হয়। Product Mix বলে একটা কথা আমরা শুনে থাকি। এর সমস্যাটা হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠান বহুবিধ দ্রব্য উৎপাদন করে থাকে সেই প্রতিষ্ঠান সর্বাধিক লাভ বা মুনাফা অর্জনের জন্য কোন্ দ্রব্যের উৎপাদন কতটা করবে? L P টেক্‌নিকে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি 'ইনভেন্টরি কন্ট্রোল' বা কত সামগ্রী কত সময় পর্য্যন্ত স্টকে রাখা ঠিক হবে, কতটা রাখা উচিত—এই জাতীয় সমস্যার সমাধানেও এ পদ্ধতি সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যে সমস্ত ক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যবস্থা নন্-লিনীয়ার অর্থাৎ আনুপাতিক সম্বন্ধে দ্বিঘাত বা তদূর্ধ্ব সমীকরণের সূত্র মেনে চলে, সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ব্যবহার করা যায় না। তবুও যেহেতু বেশীরভাগ সমস্যাতেই এ পদ্ধতির ব্যবহার করা যায় সেজন্য এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম।

গেম থিয়োরী—যে কোনও ব্যাপারে কোন ডিসিশন্ নিতে গেলে

অনেক অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বাপর বিচার-বিবেচনার মাধ্যমেই কোনও যুক্তিগ্রাহ্য ডিসিশনে পৌছানো সম্ভব হয়। অর্থাৎ সে সিদ্ধান্তকেই আমরা যৌক্তিক বলি যেখানে বিভিন্ন পরিবর্ত থেকে একটি মাত্র সিদ্ধান্তকেই বাছা হয় এবং যেটি ভবিষ্যতের বা পরবর্তী ঘটনা-সন্নিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে অভিপ্রেত ফল প্রদান করে। Success is the only condition of truth—সাফল্যই সত্যের একমাত্র মাপকাঠি। সেই সিদ্ধান্তই যথাযথ যেটি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য আনয়ন করে। দাবা খেলায় একপক্ষ প্রতিপক্ষের কি কি চাল হতে পারে তার একটা বিবেচনা করে নিয়ে ষ্ট্রাটেজী ঠিক করে নেয় এবং নিজের চাল দিয়ে থাকে। কিন্তু প্রতিপক্ষের সকল চালের বিবেচনা করা প্রায় অসম্ভব। দাবার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পরিবর্ত চাল এবং প্রতিপক্ষের তৎপরিবর্ত চালের হিসেব নিয়ে দেখা গিয়েছে যে মানুষ তো দূরের কথা অত্যন্ত দ্রুতগতির কম্প্যুটারও এই খেলার সকল চালের অনুশীলনে অপারগ। তাহলে কি যুক্তিগ্রাহ্য 'চাল' হয় না? যতদূর সম্ভব বিভিন্ন চাল ও প্রতিপক্ষের চালের অনুধাবন করে যে চাল দেওয়া যায় সেটি যদি সাফল্য আনয়ন করে তাহলে আমরা সেই চালকেই যৌক্তিক 'চাল' বলব। বস্তুত গেম্ থিয়োরীর উদ্ভব মানুষের আর্থনীতিক আচরণ ও ব্যবহারের পরিপ্রেক্ষিতেই সম্ভব হয়েছে। মানুষের কাজকর্মের পেছনে যে আর্থনীতিক অনুপ্রেরণা থাকে গেম্ থিয়োরী তারই ভিত্তিতে সংগঠিত। যতদূর সম্ভব ভালো অর্থাৎ নিজের স্বার্থের পক্ষে সবচেয়ে বেশী অনুকূল সিদ্ধান্তই মানুষ নিয়ে থাকে এবং এ সিদ্ধান্তকেই আমরা যুক্তিগ্রাহ্য বলতে পারি। মানুষ যেমন ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে এইভাবে সিদ্ধান্ত নেয় তেমনি বৃহত্তর পটভূমিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তথা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রেও এইভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি, পররাষ্ট্রনীতি তথা সমরনীতিতেও এই টেক্নিকের প্রয়োগ করা চলে। যদিও এই টেক্নিকে অংকের অনেক মারপ্যাচ বা কসরৎ রয়েছে তবুও এই টেকনিক আসলে বিভিন্ন পরিবর্ত চাল ও তৎবিপরীত চালের হিসেব নিকেষ ছাড়া অন্য কিছু নয়। সীমিত পরিসরে অর্থাৎ যেখানে বিভিন্ন পরিবর্ত ও বিপরীত চালের সংখ্যা হিসেব নিকেষের পক্ষে অত্যন্ত বেশী নয়—সেইসব সমস্যায় এই তত্ত্ব অত্যন্ত সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে।

কিউ থিয়োরী—এই টেকনিক 'কিউ' বা লাইন লাগানোর সমস্যা নিয়ে

আলোচনা করে। লোকে লাইন দিয়ে টিকিট কাটে, রেশন তোলে, বাসে ট্রেনে চাপে বা শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। ঠিক তেমনি এক জায়গায় অনেক লরী বা রেলওয়াগনের ভীড় হয়, টেলিফোন এক্সচেঞ্জে একসাথে অনেক ট্রাঙ্ককল বুক হয়ে যায় অথবা খনির মাথায় অনেক কয়লা হঠাৎ জমে যায়। এক জায়গায় এই যে পরপর সন্নিবেশ তা ঘটনাক্রমে ঘটে—অর্থাৎ যারা লাইন লাগায় তারা পরস্পর ভেবেচিন্তে লাইন লাগায় না এবং যাদের এই লাইন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তারাও কতজন লোক কোন্ বিশেষ সময়ে লাইন লাগাবে তা জানতে পারে না। কিন্তু এই লাইন বা কিউ থেকে অনেক সমস্যার উদ্ভব হয়—ট্রাফিক জাম্ হয়, ট্রাঙ্ককল বুক করে কল্ পাওয়া যায় না, রেল-ইয়ার্ডে ওয়াগন বা ডক্-ইয়ার্ডে জাহাজ জমতেই থাকে। এই জাতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য এই তত্ত্বের উদ্ভব। বাসের সংখ্যা না বাড়িয়ে, ডকের সংখ্যা না বাড়িয়ে, রেল-ইয়ার্ডে রেল লাইনের সংখ্যা না বাড়িয়ে, যে সমস্ত সুযোগ সুবিধে বর্তমান ব্যবস্থায় রয়েছে তারই যুক্তিপূর্ণ সন্নিবেশ করে এবং বর্তমান ব্যবস্থার আংগিকেই অত্যন্ত সামান্য কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন ঘটিয়ে কিভাবে অপেক্ষার সময়সীমা কমানো যেতে পারে—এই তত্ত্ব তাই নিয়েই আলোচনা করে। 'কিউ', অপেক্ষার সময়সীমা তথা বর্তমান ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধের আংকিক সংস্থাপনের ভিত্তিতে এই তত্ত্ব কয়েকটি সূত্র উদ্ভাবন করেছে। এই সূত্রসমূহের সাহায্যেই এই টেক্‌নিকের সার্থক ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিমুলেশন তত্ত্ব—এই তত্ত্বটি কিউ থিয়োরীর এককাঠি ওপরে যায়। কি সংখ্যক ব্যক্তি বা বস্তু লাইন লাগায় বা কোনও একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতজন লোক বা কতসংখ্যক বস্তু লাইন লাগাতে পারে—মোটামুটিভাবে এই সংখ্যাটি যদি স্থির করে নেওয়া যায় তাহলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। কোনো এক বিশেষ সময়ে বস্তু বা লোকজন যাই হোক না কেন কি সংখ্যায় ভীড় করবে অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোনও এক বিশেষ সময়ে কতজন লোক আসবে বা কতগুলো লরী দাঁড়াবে বা কতগুলো ট্রাঙ্ককল বুক করা হবে—সিমুলেশন তত্ত্বের সাহায্যে তা স্থির করা যায়। কি করে? Probability Theory বা সম্ভাবনা তত্ত্বের সাহায্যে। সম্ভাবনা তত্ত্ব পরিসংখ্যানের একটি যুগান্তকারী ধারণা। এর সাহায্যে প্রকৃতির 'হঠাৎ-ঘটনা' বা Chance Process-এর

মূলগত ধ্যানধারণাকে আংকিক প্রকরণের আওতায় আনা হয়, যে ঘটনা ঘটে থাকে বা ঘট্‌তে চলেছে, কাগজ কলমে সেই ঘটনার ছদ্ম-সংস্থাপন বা সিমুলেশন ঘটিয়ে অর্থাৎ একটা মডেল্ তৈরী করে তাতে সম্ভাবনা তত্ত্বের ধারণাদি প্রয়োগ করা হয়। ফলতঃ হয়তো নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, ৭ই মার্চ বেলা ১২ টায় ২৪টি লরী এসে দাঁড়াবে বজবজ্ তেলের ডিপোতে। এখানে এই লরী এসে দাঁড়ানো ব্যাপারটিতে কারুর কোন হাত নেই—অর্থাৎ লরী ড্রাইভাররা শলাপরামর্শ করে এক সাথে আসে না। অর্থাৎ সমস্ত ব্যাপারটিই চান্সের ব্যাপার। কাজেই সিমুলেশন তত্ত্ব যে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ তা সহজেই অনুমেয়, কেননা এই তত্ত্ব চান্সকেও সম্ভাবনার সীমান্তে নিয়ে আসে এবং ভবিষ্যতের ঘটনা সম্পর্কে আমাদের একটা প্রায় ঠিক ধারণা দেয়। লিনীয়ার প্রোগ্রামিং টেক্‌নিক্ যার কথা আমরা একটু আগেই বলেছি তার সঙ্গে এই সিমুলেশন তত্ত্ব মিশিয়ে পাওয়া যায় আরেকটি টেকনিক্ যার নাম ইনপুট আউটপুট অ্যানালাইসিস্।

বস্তুতঃ এই সমস্ত টেকনিক যেগুলো OR পদ্ধতিতে উদ্ভূত হয়েছে—এগুলোর ব্যবহারিক প্রয়োগে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন। অঙ্ক ও পরিসংখ্যানতত্ত্বের বিভিন্ন ধারণার বুদ্ধিমান প্রয়োগেই এই ধারণাসমূহের উদ্ভব এবং তাই ক্রমাগত বুদ্ধিমান ও যুক্তিসহ বিচার বিবেচনার মাধ্যমে উত্তরোত্তর নতুন নতুন টেক্‌নিকের উদ্ভব হতে পারে।

সিস্টেম অ্যানালাইসিস

সিস্টেম অ্যানালাইসিস্ হচ্ছে এক ধরনের পদ্ধতি বা কর্মসম্পাদনের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ সিস্টেম অ্যানালাইসিস OR বা নেট ওয়ার্কের মত যন্ত্রপাতির পর্য্যায়ে পড়ে না। এটা হচ্ছে এক ধরনের অ্যাপ্রোচ্ বা ওরিয়েণ্টেশন্ যা বুদ্ধিমান-ভাবে কার্য্যসম্পাদন করার এক যৌক্তিক আবহ তথা অভ্যাসের সৃষ্টি করে। ফলতঃ বিভিন্ন পরিবর্তের মধ্য থেকে যোগ্যটিকে বেছে নিয়ে কোনও স্থির সিদ্ধান্ত বা ডিসিশনে পৌছানো যে সহজ হয় তাই নয়, যে সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল পুংখানুপুংখ বিচারে সেটি যে সর্বোত্তম সে বিষয়েও নিশ্চিত হওয়া যায়। যে কোনও কর্ম পরিমণ্ডলেই তন্নিষ্ট ও তদ্‌বহির্ভূত সমস্যাদির কথা মনে রেখে বিভিন্ন পরিবর্ত প্রণালী তথা উপায়ের মধ্যে থেকে এমন উপায়টিকেই বাছতে

হবে যা সর্বোত্তম ফলপ্রসূ। সিস্টেম অ্যাপ্রোচ্‌ এরই একটা সার্থক বুদ্ধি বাত্‌লায়। বিভিন্ন কর্মধারা সামাজিক বা আর্থনীতিক সমস্যা ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই এর প্রয়োগ সাফল্যজনকভাবে হতে পারে।

যে কর্মপদ্ধতি বা কর্মবৃত্তের সিস্টেমের অনুশীলন করতে হবে সেই কর্মবৃত্তের লক্ষ্য ও আদর্শ স্থির করে নিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌছতে যা যা দরকার, যে যে সমস্যার আবির্ভাব ঘটতে পারে সেগুলো এবং তার সমাধান সমূহ—সব কিছু-কে পূর্বাপর বিবেচনায় সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে সংবদ্ধ করে একটা হিসেবে দেখা হয়। পরস্পর সাপেক্ষ বা পরস্পর নিরপেক্ষ বিভিন্ন কর্মধারাকে সংবদ্ধ করে একটা সাধারণ সিস্টেমের আওতায় এনে সমস্যাসমূহের বিচার তথা বিভিন্ন পরিবর্ত উপায়ের মধ্য থেকে আদর্শ উপায়টিকে খুঁজে বের করার এই যে পন্থা একেই সাধারণভাবে সিস্টেম অ্যানালাইসিস বলা যায়। সিস্টেম অ্যানালাইসিস্‌ প্রসংগে আরেকটি তত্ত্বের নাম শোনা যায়—সেটি হচ্ছে 'জেনারেল সিস্টেমস্‌ থিয়োরী'। এই দুয়ের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকলেও জেনারেল সিস্টেমস্‌ থিয়োরীর পন্থা-পদ্ধতি ভিন্ন ধরণের। অবশ্য এ দুটি তত্ত্বেরই পাশাপাশি হাত ধরে চলার উপায় রয়েছে।

সিস্টেম অ্যানালাইসিস যে এক ধরণের অ্যাপ্রোচ বা অভ্যেস সে কথা আমরা আগেই বলেছি। বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে যে কোনও একটি সিস্টেম গড়ে ওঠে। একটি সিস্টেমকে কার্য্যকরী বা ফলপ্রদ করে তুলতে হলে দেখতে হবে সেই সিস্টেমটি যেন সহজ, নমনীয়, স্বীকৃতির যোগ্য, এফিসিয়েণ্ট এবং নির্ভরযোগ্য হয়। যে কোনও সমস্যাকেই একটা সিস্টেম হিসেবে গণ্য করে বিচার বিবেচনা তথা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এই অভ্যেসটি যদি ম্যানেজারের থাকে তাহলে বহুবিধ সমস্যার সমাধান ম্যানেজারের কাছে সহজ হয়ে উঠবে।

এই প্রসংগে A-B-C অ্যানালাইসিসের কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে।

Aর অর্থ Essential বা অবশ্য প্রয়োজনীয়

Bর অর্থ Desirable বা বাঞ্ছনীয় এবং

Cর অর্থ Optional বা ঐচ্ছিক।

সিস্টেমের নির্ধারণ বা সিস্টেমের বিশ্লেষণে এই A-B-C অ্যানালাইসিস্‌ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা এই তিনটি মানদণ্ডে যাবতীয় তথ্যাদির বিচার-বিশ্লেষণ করে সিস্টেমে সন্নিবেশিত করা যায়।

ম্যানেজমেণ্ট ইনফর্মেশন সিস্টেম (Management Information System) বা MIS

সংবাদ বা তথ্যাদির গুরুত্ব যে কোনও পরিবৃত্তেই আজ সর্বজনস্বীকৃত। বস্তুতঃ বর্তমান কালে ম্যানেজারের পক্ষে কোনও ডিসিশন বা সিদ্ধান্তে পৌছানো ব্যক্তিগত বিচার বিবেচনার চেয়ে সংশ্লিষ্ট তাবৎ তথ্যাদির Quantitative বা সংখ্যাগত বিশ্লেষণের ওপরেই অধিকতর নির্ভরশীল। ফলতঃ যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌছুতে হলে ঠিক সময়ে, ঠিকমত, ঠিকঠিক তথ্যাদি অবশ্যই হাতে পাওয়া দরকার। অতএব MIS হচ্ছে যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের কর্মবৃত্তের পরিপ্রেক্ষিতে যে সমস্ত তথ্যাদির প্রয়োজন সেগুলোর সংগ্রহ, বিবেচনা ও যথাযোগ্য উপস্থাপনা এবং ভবিষ্যতের প্রয়োজন অনুযায়ী সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়ার একটি সিস্টেমের প্রচলন করা।

প্রথমে দেখতে হবে যে প্রয়োজনটা কিসের, কতখানি এবং কার কার। ম্যানেজারের হয়তো কোনও ব্যাপারে বিস্তৃত তথ্যের প্রয়োজন হবে না কিন্তু অধঃস্তন একটি পর্যায়ের কর্মীবৃন্দের পক্ষে তা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কত সময় পরে পরে—প্রত্যহ, সাপ্তাহিক, মাসান্তিক, ষাণ্মাসিক ইত্যাদি—তথ্য এবং সংবাদের পরিবেশন করতে হবে তাও প্রয়োজনীয়তার মানদণ্ডে বিচার করে দেখতে হবে। এ ব্যাপারে পূর্বোক্ত A-B-C অ্যানালাইসিসের সাহায্যও নেওয়া যেতে পারে। এর পর—সময় অর্থ/খরচ—প্রয়োজন ও উপযোগের সমীকরণের ভিত্তিতে বাস্তবে কি পদ্ধতিতে তথ্যাদির সংগ্রহ থেকে সংরক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত সিষ্টেম গড়ে উঠবে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষী শ্রম এবং কম্পিউটার—চাহিদা ও গুরুত্ব অনুযায়ী উভয়েরই ব্যবহার হতে পারে। বস্তুতঃ ব্যাপারটা যত সোজা শোনাচ্ছে আসলে মোটেই তা নয়। ব্যাপারটি বেশ জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ এবং সেজন্যই বর্তমানে এটি একটি স্বতন্ত্র বিজ্ঞান হিসেবে গড়ে উঠছে।

এই প্রসংগেই আজকাল আমরা EDP বা ইলেকট্রনিক ডাটা প্রসেসিং-এর কথা শুনে থাকি। EDP কম্পিউটার বা যন্ত্রগণকের পক্ষে অপরিহার্য কিন্তু সামগ্রিকভাবে MIS-এর একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কত তাড়াতাড়ি এবং কি পরিমাণ তথ্যাদি দরকার—প্রয়োজনের এই মাপকাঠির ভিত্তিতেই কোনও প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটারের উপযোগিতা নির্ধারিত হয়ে থাকে। বস্তুতঃ অনেক

সময় দেখা গেছে যে ইনফর্মেশন সিষ্টেমটিকে ঠিকমত বিচার বিবেচনার ভিত্তিতে দাঁড় করালে EDP ও কম্পিউটারের প্রয়োজন হয় না। কম্পিউটারে যে সিংহপরিমাণ খাই-খরচ লাগে তা একটি বিশেষ ভাবনার ব্যাপার। ফলতঃ কোনও প্রতিষ্ঠানে EDP ব্যবহৃত হবে, না মানুষী শ্রমের ভিত্তিতে তথ্যাদির বিশ্লেষণ তথা বিচার-বিবেচনা করা হবে—এই সিদ্ধান্ত, উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সামর্থ্য, চাহিদা, প্রয়োজন, গুরুত্ব ইত্যাদির উপরেই নির্ভর করবে।

EDP হচ্ছে ইলেক্‌ট্রনিক্সের সাহায্যে তথ্যাদি বিশ্লেষণ করার ব্যবস্থা। বস্তুত বর্তমান কালের কম্পিউটার আর EDP প্রায় সমার্থক। যদি খুব দ্রুত, খুবই বেশী সংখ্যক ডাটা বা তথ্যাদি বিশ্লেষণ করতে হয় তাহলে কম্পিউটার ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। তথ্যাদির সংরক্ষণের ব্যাপারেও কম্পিউটারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। খুব কম জায়গায় অকল্পনীয় পরিমাণ তথ্যাদি রাখা যায় এবং অত্যন্ত অল্প সময়ে প্রয়োজনমত সংরক্ষিত তথ্যাদির মধ্য থেকে ঠিক প্রয়োজনীয় তথ্যটি যোগাড় করা যায়। এছাড়া একটি কম্পিউটার অনেক রকমের কাজও করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ফলাফল জানাতে পারে। পূর্বোক্ত 'লিনীয়ার প্রোগ্রামিং' কম্পিউটারে ভীষণ-ভাবে খাপ খেয়ে যায় এবং 'গেম থিয়োরী' অনুযায়ী কম্পিউটারের সাহায্যে একটার পর একটা 'চাল'ও চালা যেতে পারে।

কিন্তু যে কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন তা হচ্ছে এই যে এ হেন সর্বার্থসাধক কম্পিউটারও মানুষের পরিবর্ত নয় এবং ফলতঃ কম্পিউটারে যা ঢোকানো হবে অর্থাৎ মানুষ যা ঢোকাবে ফলাফলও তদনুযায়ী হবে। কম্পিউটারও যন্ত্রবিশেষ এবং এর কোন স্বকীয়তা বা নিজস্বতা বলে কিছু নেই। ইংরেজীতে সুন্দরভাবে বলা হয়েছে—GIGO : Garbage In Garbage Out, অর্থাৎ যেমন ময়লা ঢোকানো হবে তেমন ময়লাই পাওয়া যাবে।

ম্যানেজারকে নিজেই কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ হতে হবে না। কেননা, সর্ব-বিদ্যা বিশারদ হওয়া যেমন কোনও ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়, তেমনি তার কোন প্রয়োজনও নেই। কিন্তু ম্যানেজার জানবে কম্পিউটার যন্ত্রটা কি, কি তার চাহিদা, এতে কি ঢোকানো হচ্ছে, এর কাছ থেকে কি পাওয়া যেতে পারে এবং কি পাওয়া যাবে না এবং ম্যানেজারের এ ব্যাপারে ধারণা অত্যন্ত স্পষ্ট থাকবে যে কি ব্যাপারে কম্পিউটারকে কতখানি বিশ্বাস করা যায়। এই

ব্যাপারগুলো যদি ম্যানেজারের কাছে পরিষ্কার না থাকে তাহলে ম্যানেজারকে কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ বা প্রোগ্রামের হাতের পুতুল হওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

MBO, MBE (Management By Objective, Management By Exception)

MBO এবং MBE এই শব্দ দুটি আমরা প্রায়ই বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবহৃত হতে দেখি। MBO নামের মধ্যেই বোঝা যায় যে এর অর্থ হচ্ছে objective বা উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যমে ম্যানেজ করা বা পরিচালনা করা। ব্যাপারটা যতখানি সরল শোনাচ্ছে আসলেও ব্যাপারটি তাই। সংগঠন তথা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, প্ল্যান, প্রোগ্রাম ইত্যাদিকে প্রতিষ্ঠানভুক্ত কর্মীবৃন্দের কর্ম-কুশলতা ও আত্ম উন্নয়নের প্রচেষ্টার সংগে একাংগীভুক্ত করে যে পরিচালন-ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজমেণ্ট সিষ্টেম স্থির করে তাকেই আমরা MBO বলে অভিহিত করতে পারি। মানুষের মধ্যে চিন্তাশীলতা ও কর্মপ্রবৃত্তি এই উভয় বৃত্তিই বর্তমান। MBO এমন একটা কর্মপরিবেশ বা কর্ম আবহের সৃষ্টি করে যার ফলে চিন্তা আলোচনা তথা বিচার-বিবেচনার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের কর্মীবৃন্দ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে আপন আপন স্তরের উদ্দেশ্য ও বাস্তবিক কর্মের নির্ধারণ এবং মূল্যায়ণ করে। ফলতঃ কাজ-কর্ম কতখানি হবে, কে করবে, দায়িত্ব কর্তব্য কার কতখানি থাকবে এগুলো যেমন একদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মীবৃন্দ কর্তৃক নির্ধারিত হবে, ঠিক তেমনি অপরদিকে তদনুযায়ী কর্মসম্পন্ন হল কি না এবং যদি না হয় তাহলে তার কারণগুলো নিজেরাই খুঁজে বের করবে। অতএব ম্যানেজমেণ্ট ডেভেলাপমেণ্ট তথা কাজ করতে করতে কর্মীবৃন্দকে ট্রেনিং দিয়ে আরও অভিজ্ঞ এবং শিক্ষিত করে তোলার ব্যাপারটা এই কর্মপদ্ধতির সংগে একান্তভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে।

চিন্তা, বুদ্ধি এবং বিচার বিবেচনার সাহায্যে ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করে তদনুযায়ী উদ্দেশ্য, প্ল্যান, প্রোগ্রাম ঠিক করা এবং সংগে সংগে কর্মকুশলতার মাধ্যমে সার্থকভাবে কর্মসম্পাদন করা—ম্যানেজারের এই উভয়বিধ যোগ্যতার একই সংগে পরীক্ষা হয় MBO পদ্ধতিতে। কিভাবে এই পদ্ধতি চালু করা যায়?

প্রথমতঃ SWOT অ্যানালাইসিসের সাহায্যে উদ্দেশ্যের পুংখানুপুংখ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

S অর্থ—Strength বা ভালো দিকগুলো
W ,, —Weakness বা দুর্বল দিকগুলো
O ,, —Opportunities বা সুবিধেগুলো, এবং
T ,, —Threats বা বিপজ্জনক দিকগুলো

অর্থাৎ উদ্দেশ্যগুলোর ভালো মন্দ পূর্বাপর বিচার এই চারটি দৃষ্টিকোণে করা যেতে পারে। এগুলো আবার সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ও বহিরংগ এই উভয়দিক থেকেই উদ্ভূত হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কতকগুলো কর্মধারা বা কর্মসংস্থান থাকতে পারে যেগুলোর সামান্য পরিবর্তন বা পরিবর্ধনে অত্যন্ত বেশী ফল পাওয়া যেতে পারে। এগুলোকে উপলব্ধি করতে হবে এবং খুঁজে বের করতে হবে। তৃতীয়তঃ, দীর্ঘ-সময় ও স্বল্প-সময় এই উভয় পরিপ্রেক্ষিতেই সামূহিক উদ্দেশ্যসমূহ স্থির করতে হবে। চতুর্থতঃ, এই উভয়বিধ উদ্দেশ্যসমূহের পূর্তির জন্য উভয় আংগিকেরই প্ল্যান-প্রোগ্রাম খাড়া করতে হবে। পঞ্চমতঃ, উদ্দেশ্যসমূহ উপর থেকে নির্ধারিত হবে না। একদিকে সংগঠন ও অন্যদিকে বিভিন্ন বিভাগ তথা স্তরের কর্মীবৃন্দ—একের চাহিদা ও অপরের যোগ্যতা ও সদিচ্ছা —উভয়ের টানাপোড়েনে উদ্দেশ্য নির্ধারিত হবে।

এইভাবে উদ্দেশ্য নিরূপিত হল। এইবার আসছে কাজ ও কাজের মূল্যায়নের দিকটা। প্রথমতঃ প্রত্যেক স্তরের প্রধান প্রধান কর্মী বা কর্মনায়কের দায়িত্ব, কর্তব্য, ক্ষমতা ইত্যাদির দিকটা দৃঢ়সংবদ্ধ করতে হবে। এরপর বিভিন্ন কর্মনায়কদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ ও উপরস্তর-নীচুস্তরের সংস্থান ও সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে। সংগে সংগে এটাও দেখতে হবে যে বিভিন্ন কর্মনায়কদের কর্মের মূল্যায়ণের পদ্ধতি যেন সুনির্দিষ্ট ও নির্ধারিত থাকে। দ্বিতীয়তঃ প্রাগুক্ত সুনির্ধারিত পন্থায় কর্মের মূল্যায়ণ উক্ত কর্মনায়ক যেমন একদিকে নিজেই করতে পারবে, ঠিক তেমনি বিভাগীয় প্রধানও যেন কাজের ভুলত্রুটীর কথা খোলাখুলিভাবে আলোচনা করতে পারে সেই ব্যবস্থা রাখতে হবে। কর্মের সংস্থানের দুর্বলতা এবং কর্মীর নিজস্ব দুর্বলতা এই উভয়বিধ কারণেই কাজকর্মে অসাফল্য আসতে পারে। বস্তুতঃ কোনও কর্মসম্পাদনে অসাফল্যের কারণ-গুলো যদি খোলাখুলি এবং সর্বতোমুখী আলোচনার পর স্থিরীকৃত হয় তাহলে প্রকৃত কারণগুলো যেমন জানা ও বোঝা যায় ঠিক তেমনি ভবিষ্যতে যাতে পুনর্বার অসাফল্য না আসে তাও নিশ্চিত করা যায়। কাজেই scapegoat

খুঁজে বের করা বা পাপী খোঁজা যদি এই আলোচনার উদ্দেশ্য না হয় তাহলে কর্মীবৃন্দের নিজস্ব দোষত্রুটিও ঠিকঠিক ধরা পড়ে। এর ফলে একদিকে যেমন অভিজ্ঞতা ও কর্ম-নিপুণতা বাড়ে অন্যদিকে তেমনি কর্মীর জ্ঞান ও নৈপুণ্য বাড়াবার কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে তাও বোঝা যায়। তৃতীয়তঃ কর্মীবৃন্দের ব্যক্তিগত শক্তিমত্তার মূল্যায়ণ করতে হবে। উচ্চতর পদে উন্নীত করতে হলে একদিকে যেমন উক্ত পদের প্রয়োজন ও চাহিদার কথা ভাবতে হবে, অপর দিকে তেমনি কর্মীর ব্যক্তিগত দক্ষতা ও শক্তিমত্তার কথাও ভাবতে হবে। এই মূল্যায়ণ একমাত্র উচ্চতর পদের লোকই করবে।

অতএব দেখা যাচ্ছে MBO একটা সামূহিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কর্ম ও কর্মীর যোগাযোগ অত্যন্ত স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠে। MBE হচ্ছে প্রায় এর উল্টো ব্যাপার। প্রত্যেক কর্মবৃত্তেই, ব্যবসায়িক, সামাজিক, আর্থনীতিক ইত্যাদি সকল প্রকার কর্ম-ধারায়ই, কিছু কিছু কর্ম, কর্মধারা বা কর্মের অংশ রয়েছে যেগুলো উক্ত কর্মবৃত্তের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। এগুলোর সামান্য বিবর্তনে সামগ্রিক কর্মবৃত্তটি সাংঘাতিকভাবে বিবর্ধিত বা পরিবর্তিত হয়। একটি কর্মধারায় একটু কিছু পরিবর্তনে হয়তো সামগ্রিক-ভাবে উৎপাদনের হার ও মাত্রা বহুগুণ বেড়ে যায়। প্রসংগত প্যরেতো সাহেবের (Pareto) একটা নিয়মের উল্লেখ করা চলে : কার্য ও কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বেশীরভাগ কার্যই স্বল্পতর সংখ্যক কারণের ফল হিসেবে উদ্ভূত হয়। ফলতঃ এই কারণগুলো খুঁজে বের করে সেগুলোর উপর যথাযোগ্য মর্য্যাদা আরোপ করলে কার্য সম্পাদনে সর্বোত্তম ফললাভ করা যেতে পারে।

নেট-ওয়ার্ক আলোচনায় আমরা ক্রিটিক্যাল পাথ বা সঙ্কটজনক পথ কাকে বলে দেখেছি। এটা MBE বা Management By Exception-এর একটা উদাহরণ। ম্যানেজারকে ক্রিটিক্যাল পথেই তার নিজস্ব সামর্থ্য ঢেলে দিতে হবে। অতএব ম্যানেজারের কাজ হচ্ছে যে কোনও কর্মবৃত্তের মধ্য থেকে সঙ্কটজনক পথ বা ঐ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কর্ম্মধারা খুঁজে বের করা ও তার উপর মনোনিবেশ করা। বস্তুতঃ বিশাল বিশাল কর্মযজ্ঞে সকল কাজে সমান দৃষ্টি দেওয়া কোন ম্যানেজারের পক্ষেই সম্ভব নয় এবং তার কোন প্রয়োজনও নেই। MBEর সাহায্যে ম্যানেজার বাদ দিতে দিতে ঠিক সেই কর্মধারাটিকেই খুঁজে বের করে যেটা সুইচের মত কাজ করে। সুইচ টিপলে যেমন গোটা ঘর

আলোকিত হয়। ঠিক তেমনি উক্ত কর্মধারার আবশ্যক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে ম্যানেজার সর্বোত্তম ফল অর্জন করে। আর ফল অর্জনই যেহেতু ম্যানেজারের আসল লক্ষ্য সেজন্য আসল কাজটিকে হাতে রেখে অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো ম্যানেজার তার সহকারীদের উপর ন্যস্ত করতে পারে।

MBO না MBE—কোন্ পদ্ধতিটা কোনও সংগঠনে চালু করা হবে এবং কোন্‌টা বেশী ভালো হবে এই প্রশ্নের উত্তর সংগঠনের নিজস্ব প্রয়োজন এবং উদ্ভূত সমস্যাসমূহের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করে দেখতে হবে।

এতক্ষণ ধরে আমরা বিভিন্ন টেক্‌নিকের সম্বন্ধে এই যে আলোচনা করলাম তাতে একটা জিনিস নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে এই টেকনিকগুলো কোনও সর্বার্থসাধক বা সর্ব রোগহর পন্থা-পদ্ধতির কথা বাৎলে দেয় না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে প্রচলিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তিসম্মত প্রয়োগেই এই টেকনিক-সমূহের উদ্ভব হয়েছে। এই টেকনিকগুলোর প্রয়োগ-সাফল্যের জন্য অনুকূল পরিপ্রেক্ষিতের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। রোগের উৎস ঠিকমত নির্ণয় হলে পরেই ঔষধের বিধান দেওয়া যায় এবং সেই ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্য লাভ করা যায়। কাজেই সর্বপ্রথমে সমস্যার গতি-প্রকৃতির অনুধাবন করাই সবচেয়ে জরুরী ব্যাপার। কিছু টেকনিকের সাহায্যে সমস্যাটার প্রকৃতি উপলব্ধি করা যায়, কিছু টেকনিকের সাহায্যে সমস্যা সমাধানের পন্থা-পদ্ধতি স্থির করা যায়, আবার কিছু টেকনিকের মাধ্যমে সেই নির্ধারিত পন্থা-পদ্ধতির সুষ্ঠু প্রয়োগ ঘটানো যায়। কিন্তু ম্যানেজারের আপন দক্ষতার উপরেই নির্ভর করে যে সঠিক টেকনিকের নির্বাচন ও প্রয়োগ ঘটবে কি না। অতএব, সর্বশেষ যে সিদ্ধান্তে আমরা পৌছাই তা এতক্ষণ ধরে আলোচিত সূত্রেরই পুনরাবৃত্তি : যে কোনও সংগঠন তথা প্রতিষ্ঠানে মানুষই আসল বিবেচ্য বিষয় এবং সেজন্য মানবিক সম্পদের উন্নয়ন ও যথোপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যেই লুকিয়ে আছে প্রগতির চাবিকাঠি। তাই মানুষ ও মানবিক সমস্যাগুলোই আমাদের প্রধান ভাবনা চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত।

॥ ৮ ॥

ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান ও আমাদের দেশ

এই পর্যন্ত আলোচনায় আমরা ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান কি ও কেন এবং ম্যানেজার—এই ব্যাপারগুলোরই অবতারণা করেছি এবং ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারার উপরেও এক সংক্ষিপ্ত আলোকপাতের চেষ্টা করেছি। উৎপাদন কার্যে মানুষ ও মানুষী শ্রমের ভূমিকা যে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এ কথাটাও আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করেছি। ফলতঃ মানুষকে দিয়ে কিভাবে সর্বোত্তম কাজ করানো যায়, মানুষের কাছ থেকে কিভাবে সবচেয়ে বেশী কাজ আদায় করা যায় তার পন্থা-পদ্ধতি নিয়েও আমরা বেশ কিছু তত্ত্বের আলোচনা করেছি। সবশেষে কিছু ম্যানেজমেণ্ট টেকনিকসের পরিচয় দিয়ে আমরা 'ম্যানেজমেণ্ট ও ম্যানেজার' নিয়ে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার ইতি টেনেছি।

এবারে উপসংহারে আমাদের দেশ এবং এখানকার ম্যানেজমেণ্টের ধরণ-ধারণ নিয়ে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করে আমরা এই পুস্তকের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করব।

পৃথিবীর যাবতীয় দেশসমূহকে সাধারণভাবে উন্নত ও অনুন্নত এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। কিন্তু কানা ছেলেকে কানা বললে তার খুব রাগ হয়। তাই অনুন্নত দেশ না বলে, উন্নয়নশীল দেশ বা উন্নতিকামী দেশ নামে পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশকে চিহ্নিত করার একটা ধারা গড়ে উঠল, অর্থাৎ বড়লোক আর গরীবের যে পার্থক্য সেটাই উন্নত আর উন্নয়নশীল এই দুই অভিধায় পৃথিবীর যাবতীয় দেশগুলোর ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়েছে।

কোন দেশ ও জাতি খুব গরীব আবার কোন কোন দেশ সাংঘাতিক ধরনের সম্পদশালী। বস্তুতঃ বেশীরভাগ দেশই গরীব, অল্প কয়েকটি দেশ মাত্র ধনী। কিন্তু কেন? এই পার্থক্যের কারণ কি? যে কোনও সমাজেই দেখা যায় যে কিছু ধনবান লোক থাকে মাথার ওপর আর নীচের দিকে বেশীর ভাগ লোকই থাকে গরীব। এই গরীব ও ধনীর ধারণা কিন্তু শুধুমাত্র আপেক্ষিকই নয়, অনেকাংশে সামাজিকও বটে। ভারতবর্ষের গরীব লোক

আর ইয়োরোপ আমেরিকার গরীবলোক এক নয়। ভারতবর্ষে যে স্তরের জীবন যাত্রার প্রণালীকে আমরা ধনবান পর্য্যায়ভুক্ত করি আমেরিকার জীবনযাত্রার মানের বিচারে তা মোটেই ধনী পর্য্যায়ভুক্ত নয়। কোনও দেশ উন্নত বা অনুন্নত কি না তা উক্ত দেশের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের জীবনযাপনের মানের উপরে নির্ভর করে। জীবনযাত্রার মান ব্যাপারটা কি? জীবনযাত্রার মান বলতে মোদ্দা কথায় যা বোঝানো যায় তা হচ্ছে কে কেমন খায়, কেমন কাপড়-চোপড় পরে, কেমন বাড়ীতে থাকে, গাড়ী-ঘোড়া কেমন ব্যবহার করে, ছুটি-ছাটা কেমনভাবে কাটায়, দানধ্যান করার মতো পয়সা কড়ি আছে কি না, ছেলেমেয়েদের কি ধরনের শিক্ষা দেয়, কোন্ ধরণের স্কুল কলেজে ছেলেমেয়ে-দের পড়ায়, অবসর বিনোদন কিভাবে করে, কি ধরণের বন্ধু-বান্ধব বা ক্লাবে মেলামেশা করে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোনো দেশের অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে জাতির বিচারে আমরা দেখব যে জাতীয় আয় কত এবং গড়পড়তা ব্যক্তিগত আয় কত অর্থাৎ লোকসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় আয় কিভাবে ক্রমশঃ বাড়ছে বা কমছে এবং তা কেমনভাবে সেই দেশের জনসাধারণের মধ্যে বন্টিত হচ্ছে। আরোও বিশদ করে দেখলে দেখতে হবে, গড়পড়তা হিসেবে প্রতি ব্যক্তি পিছু কত তেল, ষ্টিল, ইলেকট্রিসিটি বা কয়লা ব্যবহার হচ্ছে, লোকসংখ্যার অনুপাতে কত মোটরগাড়ী, জাহাজ, এরোপ্লেন, টি. ভি. বা রেফ্রিজারেটার উৎপন্ন হচ্ছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে। অর্থাৎ সোজা কথায় প্রতি লোক পিছু জাগতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ যদি বেশী হয় তবেই কোনও দেশকে আমরা সমৃদ্ধশালী বলতে পারি।

জাগতিক সম্পত্তি মূলতঃ শিল্পজাত সামগ্রী। যে সমস্ত বস্তুগুলোকে সম্পত্তি বলে গণ্য করা যায় সেগুলো সবই কোনো না কোনো শিল্পের উৎপন্ন সামগ্রী। তাই বলা হয় যে শিল্পই সমস্ত ধন-সম্পদের উৎস। বস্তুতঃ শিল্পের উন্নতির মধ্যেই অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাবিকাঠি নিহিত আছে। পৃথিবীর যে সমস্ত দেশকে আমরা অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত বলি তার প্রত্যেকটিই শিল্পে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। তাই যে কোনও উন্নতিকামী বা উন্নয়নশীল দেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটানো। কল-কারখানা যদি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে না পড়ে, দেশের অর্থনীতি যদি একান্তভাবে শিল্প নির্ভর না হয়, দেশের বেশীর ভাগ লোকের জীবিকা যদি শিল্প থেকে না আসে তাহলে আমরা সমৃদ্ধির মুখ দেখতে

পারবো না। দেশ তথা জাতিকে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিয়ে বিভিন্ন আনুষংগিক কর্মধারায় না ছড়িয়ে দিতে পারলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। তাই অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করা আর শিল্পে দ্রুত উন্নতি ঘটানো প্রায় সমার্থক কথা।

দ্রুত শিল্পায়ন কিভাবে করা যায়? শিল্পে দ্রুত উন্নতি ঘটাতে হলে কি কি প্রাথমিক শর্তের পূর্তি অবশ্য প্রয়োজনীয়? কেন কিছু দেশ বহু চেষ্টা করেও শিল্পে দ্রুত উন্নতি দেখাতে পারছে না? কেন ধনী ও দরিদ্র দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার যে ব্যবধান তা ক্রমশঃ বিস্তৃততর হচ্ছে?

আমরা জানি যে উৎপাদনের উপাদান প্রধানতঃ চার প্রকারের—জমি, শ্রম, মূলধন এবং উদ্যোগ। জমির অর্থ হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ প্রকৃতি যা দেয় যতটা দেয় তার চেয়ে বেশী আমরা বাড়াতে পারি না। আমরা এর ব্যবহার করি, এর রূপান্তর ঘটিয়ে অন্যকিছু তৈরী করতে পারি—কিন্তু এর পরিমাণ বাড়াতে পারি না। শ্রমের সাহায্যে প্রাকৃতিক সম্পদের রূপান্তর ঘটানোই উৎপাদনের লক্ষ্য। শ্রম দুই প্রকারের—কায়িক এবং মানসিক। উন্নয়নশীল দেশে এই দুই উপাদানের হয়তো কোনও অভাব নেই। কিন্তু মূলধন ও উদ্যোগের অভাবই হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের আসল সমস্যা, যন্ত্রপাতিসমূহকে মূলধন বলা হয়—এগুলো হচ্ছে উৎপাদনের হাতিয়ার। কিন্তু সঞ্চয় ছাড়া যন্ত্রপাতি উৎপাদন হতে পারে না। লোকে যা উপার্জন করবে তার কিছু অংশ সঞ্চয় করবে। সেই সঞ্চয় উৎপাদনে বিনিয়োগ হবে এবং তার ফলে যন্ত্রপাতি তৈরী হবে। মূলধন বলতে টাকাকড়ির সঞ্চয় থেকে যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত সবকিছুই বোঝায়। কিন্তু টাকাকড়ির সঞ্চয় থেকে যন্ত্রপাতির উৎপাদন—এই বিরাট ব্যাপারটার মধ্যে কারিগরী যোগ্যতা তথা ক্ষমতার এক বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। অনুন্নত দেশসমূহে এই কারিগরী যোগ্যতার বিশেষ অভাব রয়েছে। গরীব দেশে আয় কম, তাই সঞ্চয় কম; ফলে বিনিয়োগও কম। বিনিয়োগ কম বলে আয় কম। ফলতঃ সঞ্চয় ও আয়ের এক দুষ্টচক্র এইসব দেশে কাজ করে। এই সঞ্চয়ও না হয় নানাভাবে বাড়ানো গেল—কিন্তু তাতেই সমস্যার সমাধান হয় না। বলা যায় সমস্যার এখানে শুরু। অনুন্নত দেশের যা প্রধান অভাব তা হচ্ছে উদ্যোগের। উদ্যোগ এক ধরণের প্রবৃত্তি যা গতিশীল এবং স্বচ্ছন্দ। আপন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে

কিছু লোক লাভ-লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরা জমি,
শ্রম ও মূলধন নিযুক্ত করে কারিগরী দক্ষতার সন্নিবেশে আপন আপন জ্ঞান ও
বুদ্ধির সাহায্যে নূতন নূতন বস্তুর উৎপাদনে নিজেকে নিযুক্ত করে। সভ্যতার
বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু জাতি বা দেশ যেমন একদিকে এগিয়ে গেছে তেমনি
অপর দিকে কিছু দেশ অনেকখানি পিছিয়ে গেছে। এর কারণ হচ্ছে প্রধানতঃ
ব্যক্তিগত উদ্যোগের তারতম্য। যে দেশ জড়তার শৃঙ্খলে নিজেকে জড়ায়নি,
যে দেশে নূতন নূতন চিন্তা ভাবনায় নূতন নূতন কর্ম-প্রচেষ্টা উৎসাহ পেয়েছে
সেই দেশ আগে এবং দ্রুত শিল্পোন্নত হয়েছে। আমরা জানি গ্রেট ব্রিটেনে
অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে শিল্প বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছিল। যে স্টীম-
ইঞ্জিন থেকে শিল্প-বিপ্লবের শুরু সেই স্টীম ইঞ্জিন কিন্তু প্রথমে ফ্রান্সেই আবিস্কৃত
হয়েছিল। তৎকালীন ফরাসী সমাজ এই আবিষ্কারটিকে মাথা তুলে উঠতে
দেয়নি। ফলতঃ ফরাসী দেশ ও জাতি শিল্প বিপ্লব শুরু করার প্রথম সুযোগ
থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে, গ্রেট ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক
আবহাওয়া শিল্পের বিকাশ তথা নূতন নূতন ধ্যান-ধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগের
পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ছিল। তাই ফরাসীরা যখন ফরাসী বিপ্লবের রাজনৈতিক
ডামাডোলে জড়িয়ে পড়েছে, গ্রেট ব্রিটেন তখন বৃহদায়তন শিল্পস্থাপনের পথে
অনেকখানি এগিয়ে গেছে। সে যাই হোক, আসল কথাটা হচ্ছে এই যে
উদ্যোগহীনতার ফলে পৃথিবীর বেশীর ভাগ দেশ আর্থিক প্রগতির ভিত্তিতে
অনেকখানি পিছিয়ে রয়েছে।

উন্নয়নশীল দেশেরা খুব তাড়াতাড়ি অর্থনৈতিক উন্নতি করতে চাইছে।
শিল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে যারা বনেদী অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকা
যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলো যে সময়ে এবং যে ভাবে নিজেদের
শিল্পোন্নয়ন ঘটিয়েছে, উন্নতিকামী দেশগুলো তার চেয়ে অনেক তাড়াতাড়ি
শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে চাইছে। তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে দেখলে বলা যায় পশ্চিমী
শিল্পোন্নত দেশগুলো সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অনেক
আগেই পৌছিয়ে গিয়েছিল। এবং বর্তমানে তারা কল্যাণমূলক ব্যবস্থা বা
welfare state এ পরিণত হওয়ার কম বেশী চেষ্টায় নিযুক্ত রয়েছে। অনুন্নত
দেশগুলোর বেশীর ভাগই কৃষিপ্রধান; এবং তাই সামন্ততান্ত্রিক বা প্রায়-
সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অঙ্গীভূত। কোনও অনুন্নত দেশই আজ আর অনুন্নত

থাকতে চাইছে না—তারা জাগছে। তাই আমরা এদের উন্নতিকামী দেশ বলছি। শুধু উন্নতি করতে চাইছে বললে ভুল হবে—অতি দ্রুত উন্নতি করতে চাইছে। কেননা এদের দেশের জনসাধারণ বুঝতে পেরেছে যে ইউরোপ-আমেরিকার জনসাধারণ যে সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করে সেই সুখ স্বাচ্ছন্দ ভোগ করার মধ্যে জীবনধারণের সার্থকতা নিহিত রয়েছে। ফলতঃ উন্নতিকামী দেশসমূহের জন-নায়কদের ভাবতে হচ্ছে কী করে সবচেয়ে দ্রুত শিল্পোন্নয়ন ঘটানো যায় এবং কী করে তাদের দেশের জনসাধারণকে জাগতিক স্বাচ্ছন্দের সকল সুখ অবিলম্বে দেওয়া যায়। বর্তমান কালের শিল্পোন্নত দেশগুলোর সামনে কিন্তু এই সমস্যা ছিল না। ফলতঃ তারা প্রথমে সামন্ততন্ত্র থেকে দেশকে ধনতন্ত্রের সমাজ ব্যবস্থাতে নিয়ে যেতে কোনও বিশেষ বেগ পাননি। দ্রুত শিল্পায়ন হওয়ার পর এবং শিল্পসমৃদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পরই তারা কল্যাণ-মূলক ব্যবস্থার কথা ভাবতে পেরেছে। অর্থাৎ সামগ্রিক ভাবে দেশের জনসাধারণকে সমৃদ্ধ জীবন যাপনের সুযোগ দেবার কথা সমৃদ্ধি লাভ করার অনেক পরেই ভেবেছে। কিন্তু বর্তমানকালের উন্নতিকামী দেশসমূহের সামনে এ সুযোগ মোটেই নেই। একদিকে যেমন দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাতে হবে, অন্য-দিকে ঠিক তেমনি এই শিল্পায়নের যে লাভ, তা সমগ্র জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে।

ফলতঃ বেশীর ভাগ উন্নতিকামী দেশ দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্পায়নের উপর বিশেষ জোর দিচ্ছে। কিন্তু কিভাবে এই শিল্পায়ন হবে? উন্নত দেশগুলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প-উদ্যোগ স্থাপন এবং লাভ অর্জনের যে পদ্ধতি তার মাধ্যমেই উন্নতিলাভ করেছে। সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো রাষ্ট্রীয় মালিকানার মাধ্যমে শিল্প-উদ্যোগ স্থাপনের পথে এগিয়েছে। কিন্তু তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো অর্থাৎ যারা এই মূল দুই গোষ্ঠীর বাইরে তারা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এই উভয় ব্যবস্থার সংমিশ্রণে এক নূতন পদ্ধতির অনুসরণ করছে। এই ব্যবস্থাকে মিশ্র পদ্ধতি নামে অভিহিত করা যায়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথা অতিবৃহৎ শিল্প-সমূহের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় কম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মালিকানা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। এই মিশ্র ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অতি মহৎ।

ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় যে সুফলগুলো পাওয়া যায়—সেগুলো কোনও ব্যক্তি-বিশেষকে অর্জনের সুযোগ না দিয়ে বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র নিজের হাতেই রাখতে চায়। আবার তেমনি ব্যক্তির নিজস্ব উদ্যম এবং উদ্যোগকে একেবারে বন্ধ না করে দিয়ে নির্ধারিত শিল্পক্ষেত্রে বিস্তারের সুযোগ দেওয়া যায়। ফলতঃ উভয় ব্যবস্থার সুফলগুলোকে একই সঙ্গে অর্জন করা যায় এবং প্রগতির গতি ত্বরান্বিত হয়। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায় যে উভয় ব্যবস্থার সুফলগুলোর পরিবর্তে উভয় ব্যবস্থার ত্রুটিগুলোই এক সঙ্গে অর্জন করার মত পরিস্থিতির উদ্ভব হচ্ছে। সে যাই হোক, আজকের দুনিয়ায় উন্নতিকামী দেশ-গুলোর সামনে সকল দিক দিয়ে বিচার করলে এই পন্থার চেয়ে আদর্শতর কোনও পথ খোলা নেই।

অন্ন-বস্ত্র-গৃহ এই মৌল সমস্যাগুলোই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের নিরাপত্তা তথা সর্ববিধ জাগতিক সুখ সুবিধার ব্যাপারে আজকালকার ব্যক্তিমানুষ রাষ্ট্রের বা সরকারের মুখাপেক্ষী। আজকালকার রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে ইচ্ছায়ই হোক আর অনিচ্ছায়ই হোক কল্যাণকারী ভূমিকা নিতে হচ্ছে এবং ফলতঃ জীবনের সর্বক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অমোঘ প্রভাব এবং খবরদারী তথা অভিবাবকত্ব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠছে। তাই শুধুমাত্র পুলিশ বা মিলিটারীই নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব দেবার জন্য রাষ্ট্রকে এক বিরাট প্রশাসনিক কাঠামো তৈরী করতে হচ্ছে। এই নেতৃত্ব সার্থক করতে হলে সুদক্ষ প্রশাসকের প্রয়োজন। কিন্তু এই সুদক্ষ প্রশাসক কোথায় পাওয়া যাবে? উন্নতিকামী দেশ-সমূহের সামনে যে প্রধান সমস্যাগুলো রয়েছে তা যে মূলধনের অভাব, উদ্যোগহীনতা এবং Managerial skill-এর অভাব, তা আমরা আগেই দেখেছি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়ে রাষ্ট্র নিজেই উদ্যোগ নিচ্ছে এবং মূলধন সংগঠনের চেষ্টা করছে। রাষ্ট্র আসলে একটি ব্যক্তিক সত্ত্বা অর্থাৎ যে জনমণ্ডলী নিয়ে রাষ্ট্র সংগঠিত সেই জনমণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য আচার ব্যবহার দোষ-গুণ ইত্যাদি রাষ্ট্রতে বর্তায়। শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই নেতৃত্ব দেবার জন্য যেখানে প্রকৃত কর্মীর অভাব, সেখানে সামাজিক তথা সর্ববিধ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেবার লোক কোথায় পাওয়া যাবে? দক্ষ ম্যানেজার বা প্রশাসক তাই আজকের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অত্যন্ত জরুরী প্রয়োজন। এই জাতীয় লোকেদের অভাবই যেকোনও উন্নতিকামী দেশের সামনে প্রধান সমস্যা। বিবেকানন্দ যেমন বলেছিলেন—

আমাকে আরও দুটি মানুষ দাও আমি নতুন ভারত গড়ে দেব—এ কথাটার অন্তর্নিহিত ভাবটি আজকেও সত্য। মানুষই আসল সম্পদ এবং আসল সমস্যা।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের জন্য এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। ইংরেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখা, ইংরেজের তাঁবে রাখা এবং যতদূর সম্ভব বেশী সম্পদ আহরণ করা। ভারতবর্ষ বা এখানকার লোকজনের স্বার্থ ইংরেজের কাছে মোটেই প্রধান ছিল না, গ্রেট বৃটেনের স্বার্থই ভারত শাসনের মাপকাঠি ছিল। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেল ১৯৪৭ সালে। ভারতবর্ষের লোকজনের আশা-আকাঙ্খা এবং উদ্দীপনা তখন থেকে অন্য ধাঁচে বইতে লাগল। এরা যে শুধুমাত্র খাওয়া পরার সমস্যার সমাধান চাইল, তাই নয়, পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশগুলোর মত নিজেদেরও অবস্থার পরিবর্তন চাইল। এর জন্যে এরা অপেক্ষা করতেও আর রাজী নয়—"আভী কর, জলদি কর" গোছের একটা মনোবৃত্তিও এদের মধ্যে ক্রমশঃ অত্যন্ত জোরদার হয়ে উঠলো। ফলতঃ আজকের প্রশাসকদের কাছে ভারতবর্ষের জনগণের প্রত্যাশা অনেক। তাই আজকের প্রশাসন ব্যবস্থার দায়িত্ব পূর্বের তুলনায় শুধু যে অনেক বেড়ে গেছে তাই নয়, অনেক বেশী গুরুত্বও অর্জন করেছে।

আজকের সমস্যা শুধু ব্যক্তির সমস্যাই নয়, পদ্ধতিরও সমস্যা। একদিকে যেমন উদ্যোগ এবং Managerial skill-এর অভাব রয়েছে অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপযোগী আবহ তথা ম্যানেজমেণ্ট পদ্ধতিরও অভাব রয়েছে। অর্থাৎ উপযুক্ত ব্যক্তির যেমন অভাব তেমনি ব্যক্তির বিকাশের পক্ষে অনুকূল পরিবেশেরও অভাব। এই দুই-এ মিলে আমাদের সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলেছে। পূর্বে আলোচিত স্টীম ইঞ্জিনের কথাতেই আবার আসা যাক। তদানীন্তন ফরাসী সমাজ যেহেতু নূতন উদ্যম ও উদ্যোগের পক্ষে অনুকূল ছিল না, সেহেতু স্টীম ইঞ্জিনের মত যুগান্তকারী আবিষ্কারকে মাথা তোলার সুযোগ দেয়নি। আমাদের দেশে যেখানে পৃথিবীর প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক বাস করে, সেখানে ব্যক্তিগত প্রতিভার হয়তো আসলে তেমন অভাব নেই। আসল অভাব যা তা হচ্ছে ব্যক্তিগত প্রতিভার বিকাশের পক্ষে উপযুক্ত সুযোগের অভাব। এই সুযোগ শুধু যে সামাজিক

বা অর্থনৈতিক তাই নয়, সংগঠনগত এবং পদ্ধতিগতও বটে। এই প্রসঙ্গে আমরা পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আলোচিত ব্যক্তি ও সংগঠনের পারস্পরিক কথা স্মরণ করতে পারি।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের প্রধান দায়িত্ব ইচ্ছায়ই হোক অনিচ্ছায়ই হোক আজ যেহেতু রাষ্ট্রকে এগিয়ে এসে নিতে হয়েছে, সেজন্য রাষ্ট্রকে এ ব্যাপারে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রশাসন বা Administration আসলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষে অনুকূল নীতি নির্ধারণ এবং পরিচালনা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু উন্নতি করতে হলে বা বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে নূতন ভাবনা চিন্তা, নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কর্ম-পরিচালনার ক্ষেত্রে নূতন চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ করতে হবে। একেই বলা যায় ম্যানেজমেণ্ট। অর্থাৎ আজ সারা দেশ জুড়ে, সবরকমের প্রতিষ্ঠানে কিছু ম্যানেজারের অবশ্যই দরকার হয়ে পড়েছে। এই ম্যানেজার বলতে আমরা ম্যানেজার নামধারী কিছু লোকের কথা বলছি না, যে কোনও কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তি যেন ম্যানেজমেণ্ট-শাস্ত্রসম্মত পন্থা-পদ্ধতি অনুযায়ী কাজকর্ম পরিচালনা করেন, সেই কথাই বলছি। অফিস-কাছারী, হাসপাতাল, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কল-কারখানা ইত্যাদি সব রকমের প্রতিষ্ঠানে যাঁরা কাজ করছেন এবং কাজকর্মের পন্থা পদ্ধতি ঠিক করছেন, তাঁদের সবাইকে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হবে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কী হচ্ছে? স্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু করে হাসপাতাল বা যে কোনও অফিস কাছারী পর্যন্ত তাবৎ প্রতিষ্ঠান-সমূহে আমরা কি নৈরাজ্য তথা অব্যবস্থা লক্ষ্য করছি না? এই নৈরাজ্য বা অব্যবস্থার কারণ যে বহুবিধ, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। হাসপাতালের কথাই ধরা যাক। রোগী এবং রোগের তুলনায় আমাদের দেশে হাসপাতালের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। পাড়াগাঁয়ের হাসপাতাল, মফস্বল শহরের হাসপাতাল এবং বড় বড় শহরের নামকরা হাসপাতাল—সুযোগ সুবিধা, ঔষধপত্র, ডাক্তার-বিশেষজ্ঞের ব্যবস্থা, শয্যাসংখ্যা, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামের সরবরাহ ইত্যাদি সব ব্যাপারেই এগুলোর মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য রয়েছে। অথচ দেশের লোকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃ বর্ধমান। জলপড়া, পাতাপড়া তো অনেক দূরের কথা আয়ুর্বেদীয়, হেকিমী বা প্রাকৃতিক চিকিৎসায়

দেশের বেশীরভাগ লোকেরই আজ আর কোন আস্থা নেই। ফলতঃ গ্রাম-শহরের যাবতীয় লোক হাসপাতালে গিয়ে ভীড় করছে। পাড়া গাঁয়ের প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে শুরু করে শহরের নামী হাসপাতাল পর্যন্ত সর্বত্র কেবল ভীড় আর ভীড়। এর কারণ কি ? জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারটা সামগ্রিক-ভাবে রাষ্ট্র নিজের হাতে নিয়েছে। প্রত্যেক বছর বাজেটে বা প্রত্যেক পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্য, হাসপাতাল, চিকিৎসা ব্যবস্থা ইত্যাদি খাতে কিছু টাকা বরাদ্দ করা হচ্ছে এবং প্রত্যেক বছর পরিকল্পনামত এই টাকা খরচ করে জনস্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজনীয় সম্পদ এবং চিকিৎসাব্যবস্থার আনুষংগিক সম্পদ ও উপকরণ গড়ে তোলা হচ্ছে। নতুন হাসপাতাল তৈরী হচ্ছে, শয্যা-সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে, গাড়ী-ঘোড়া বা অ্যাম্বুলেন্স কেনা হচ্ছে, নতুন চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী বা আমদানী করা হচ্ছে, চিকিৎসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণা কার্য সম্প্রসারিত করা হচ্ছে ইত্যাদি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এটা কি যথেষ্ট ? লোকসংখ্যার অনুপাতে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ কি যথেষ্ট ? আমরা গরীব দেশ—নুন আন্‌তে পান্তা ফুরোয় অবস্থা। তাই বাজেট বরাদ্দ যে আশানুরূপ বাড়ানো যাবে না সেটা ঠিক কথা। কিন্তু গ্রামে গ্রামে একটা বাড়ী তৈরী করে লাল-নীল জল মেশানো কয়েকটা ওষুধের ব্যবস্থায় যে কোনও লাভ হয় না সেটাও ঠিক কথা। একবার আমরা প্রচার করি যে অ্যালো-প্যাথিক চিকিৎসা ব্যবস্থাই বর্তমানের একমাত্র বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা। তারপর যখন দেখি যে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা অত্যন্ত costly অর্থাৎ এর খরচা চালানো এক বিরাট ব্যাপার তখন আমরা প্রচার করি যে হোমিওপ্যাথিক, হেকিমী বা আয়ুর্বেদীয়, মায় প্রাকৃতিক চিকিৎসা পর্যন্ত সব কিছুই আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু গ্রামের লোকও আজ অনেক চালাক। তারা মনে করে যে তাদের পেছনে পয়সা কম ঢালার জন্য এগুলো কমখরচী ব্যবস্থা। তাই পড়ি কি মরি অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতালেই জান বাঁচানোর জন্যে ভীড় করতে হবে। এই কথাগুলো বলার কি উদ্দেশ্য ? স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে লোক সংখ্যা ও আমাদের সামর্থ্যের পারস্পরিক চুলচেরা বিচার করে কোনোও স্থির, সুনির্দিষ্ট প্ল্যান কি আমাদের আছে ? এই প্ল্যানিং আমাদের পাকা নয়, যে প্ল্যান-প্রোগ্রাম কিছুটা আছে তা কোনও integrated plan-এর আওতায় পড়ে না। Integrated plan ব্যাপারটা কি ? যতদূর সম্ভব সর্ববিধ সুবিধা-

অসুবিধা, সর্বপ্রকার ব্যবস্থা-অব্যবস্থার কথা ভেবে নিয়ে পরস্পর সাপেক্ষতার ভিত্তিতে সার্বিক ও সুদূর প্রসারী পরিপ্রেক্ষিতে যে প্ল্যান করা যায় তাকেই ইণ্টেগ্রেটেড প্ল্যানিং বলা যেতে পারে। ধরা যাক আগামী ১০ বৎসরে কত হাসপাতাল বানানো হবে, কত শয্যাসংখ্যা বাড়ানো হবে, কত ঔষধপত্র লাগবে, তার কতটা আমদানী করতে হবে ও কতটা দেশে তৈরী করা যাবে, কত ডাক্তার লাগবে, কত ডাক্তার বিদেশে শিক্ষা পাবে, কত চিকিৎসা সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি তৈরী হবে, তার জন্যে কোনও বিদেশী কারিগরী সাহায্য লাগবে কি না, কত অ্যাম্বুলেন্স লাগবে, গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স চলার মত রাস্তা না থাকলে কত রাস্তা বানানো হবে বা অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানের বদলে গরুর গাড়ী, নৌকো ইত্যাদির ব্যবহার করা হবে, হাসপাতাল তৈরী করতে যে ষ্টিল বা সিমেণ্ট লাগবে তা অন্যান্য ক্ষেত্র যথা শিল্প বা আবাসন ইত্যাদির প্রয়োজন মিটিয়ে পাওয়া যাবে কি না, যদি না পাওয়া যায় তাহলে সিমেণ্ট উৎপাদন বাড়ানোর পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না বা নেওয়া হয়েছে কি না ইত্যাদি বহুরকমের সমস্যার কথা ভেবে নিয়ে সার্বিক দৃষ্টিতে যেকোনও প্ল্যান করতে হবে। এই ভাবে দেখলে দেখা যাবে যে স্বাস্থ্য, শিল্প, শিক্ষা, গৃহ-নির্মাণ, আইন শৃঙ্খলা এমন কি পররাষ্ট্র নীতি পর্যন্ত সবকিছুই পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। এই সম্পর্কের যতদূর সম্ভব আদ্যোপান্ত বিবেচনা করে নিয়েই স্বাস্থ্য সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ বা প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে। এই নীতিনির্ধারণ বা প্ল্যান-প্রোগ্রাম ঠিক করা হচ্ছে higher ম্যানেজমেণ্ট বা টপ লেভেল ম্যানেজমেণ্টের কাজ। প্ল্যানিং-কমিশন, হেলথ সেক্রেটারিয়ট বা হেল্থ ডাইরেক্টরেট এই কাজগুলো ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান সম্মতভাবে সমাধা করবেন।

ঠিক তেমনি নিম্নতর লেভেলেও ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রয়োগ করতে হবে। ধরা যাক একটি হাসপাতাল—যে কোনও মহকুমা বা জেলা-হাসপাতালের কথা। একদল প্রবীন ডাক্তার হচ্ছেন হাসপাতালের প্রধান। বিভিন্ন বিভাগে কিছু ডাক্তার রয়েছেন। কিছু নার্স, কিছু GDA বা জেনারেল ডিউটি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রয়েছেন। একটি দুটি অ্যাম্বুলেন্স ও তার ড্রাইভার রয়েছে। ইনডোর, আউটডোর এবং ইর্মাজেন্সি বিভাগ রয়েছে। রেডিও-লজি এবং মোটামুটি ভাবে প্যাথল্যাজি বিভাগ রয়েছে। মর্গ রয়েছে—যেখানে পোষ্টমর্টেম পরীক্ষা হয়ে থাকে। যে প্রবীন ডাক্তার হাসপাতালের প্রধান,

তিনিই হচ্ছেন হাসপাতালের মুখ্য কর্মনির্বাহক। ছুটিছাটা, সাধারণ প্রশাসন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, কাজকর্মের হিসেব নিকেষ, শিফ্‌ট ডিউটির সুষ্ঠু বিন্যাস, প্রয়োজনমত ঔষধপত্র বা অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করা (কিছু ক্ষেত্রে তাঁর কিছু কিছু ঔষধ কেনার ক্ষমতা আছে), রোগীদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা, জল-আলো ইত্যাদির ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা, অন্যান্য যাবতীয় প্রতিষ্ঠান তথা সরকারী বিভাগের সঙ্গে সংযোগ রাখা, ডাক্তার নার্স বা GDA দের সমস্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সমস্যা সমাধানে ব্রতী হওয়া ইত্যাদি তাবৎ সমস্যা কাঁধে নিয়ে এঁর আর ডাক্তারী করার সময় থাকে না। অর্থাৎ কোন ডাক্তারকে যদি ডাক্তারী ছাড়া এইসব করতে হয় তাহলে তাকে হাসপাতালের প্রধান করে দিলেই হয়।

এই ধরণের ব্যবস্থা নিয়ে হাসপাতাল দাঁড়িয়ে আছে রোগীর সেবা করার জন্য। সকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আউটডোর বিভাগ খোলা থাকে। সারা মহকুমার যাবতীয় রোগী-রোগিণীর দল এখানে এসে লাইন লাগায়। আউট-ডোর বিভাগে পালা করে এককেজন ডাক্তার ডিউটি করেন। রোগীর নামধাম ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় নিয়ে টিকিট হয়ে গেলে ডাক্তার রোগের বিবরণী লিখে দেন। বুক-পেট টিপে বা ষ্টেথিসকোপ লাগিয়ে বেশীরভাগ রোগীদের নিদান দেওয়া হয়। জটিল কেসগুলোকে বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। বস্তুতঃ খুব কম সময়ের মধ্যে যত রোগীরোগিনী লাইনে দাঁড়ায় তাদের রোগের নিদান দিতে হয় বলে—অনেক সময় ডাক্তার রোগীর দিকে মুখ তুলে তাকানোর সময়ও পান না। এ যেন বিস্কুটের বা কলগেট টুথপেষ্টের ফ্যাক্টরী। একের পর এক আসছে আর চটপট ছাপছোপ লেগে প্যাকিং হয়ে চলে যাচ্ছে। যত রোগীকে হাসপাতালে জায়গা দেওয়া যায় তার চেয়ে বেশী রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। অনেক হাসপাতালেই ঘর-বারান্দা ভর্তি হয়েও মেঝেতে রোগী শুয়ে থাকে। ঔষধপত্রও প্রয়োজনের তুলনায় কম থাকে। ডাক্তার, GDA বা নার্স সকলকেই সাধ্যের অতিরিক্ত কাজ করতে হয়। অথচ রোগী-রোগিনীর দল কিন্তু সন্তুষ্ট নয়। তারা ভাবে যে তাদের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে না। ফলতঃ কোন রোগী মারা গেলে তার আত্মীয়স্বজনেরা স্বাভাবিকভাবেই হাসপাতালের প্রতি বিমুখ হয়ে ওঠে। মারধোর, টেবিল চেয়ার ভাঙা, হাসপাতাল তছনছ করা খুব একটা বিরল

ঘটনা নয়। কিন্তু মজার কথা হচ্ছে এই যে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিচার করলে এবং ডাক্তার ও রোগীর দৃষ্টিভংগী থেকে তলিয়ে দেখলে কাউকেই বিশেষ কোন দোষ দেওয়া যায় না অথবা উভয়কেই সমান দোষ দেওয়া যায়। এ যেন এক অবশ্যম্ভাবী ভবিতব্য যার থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই!

কি করে এ সমস্ত সমস্যা দূর হয়? উত্তর একটিই। হাসপাতালের সংখ্যা বাড়িয়ে প্রতি থানা বা প্রতি ব্লকে একটি করে যদি বর্তমান মহকুমা হাসপাতালের মাপে হাসপাতাল করা যায় তাহলে বোধহয় হাসপাতালগুলো অন্যান্য সভ্য দেশের মত চলতে পারে। কেন বর্তমানে তা করা হচ্ছে না? আমাদের মত অনুন্নত দেশের পক্ষে এখনই এত খরচ করা সম্ভব নয়। তাহলে উপায় কি? হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে সম্পদ আমাদের রয়েছে—সমস্ত প্রতিকূলতার বিবেচনায় সেগুলোর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহারই আমাদের করতে হবে।

হাসপাতালের প্রধান কর্মনির্বাহককে একজন ম্যানেজারের মত কাজ করতে হবে, অর্থাৎ ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের নির্দেশগুলোকে কাজে লাগাতে হবে। হাসপাতালে যে প্রচুর সমস্যা রয়েছে সে কথা আমরা আগেই বলেছি। সমস্যা-সমাধানের আসল উপায় যে হাসপাতালের সংখ্যা বাড়ানো তাও আমরা দেখেছি। কিন্তু যে সমস্যাসঙ্কুল হাসপাতাল আমাদের রয়েছে তার internal ম্যানেজমেণ্ট কতটা উন্নত করা যায় সেটাই এখন আমাদের বিবেচ্য। আরো হাসপাতাল, আরো ডাক্তার বা আরো ওষুধপত্র চাই বলে না চেঁচিয়ে আমাদের হাতে যে হাসপাতাল ব্যবস্থা রয়েছে তার সর্বোত্তম utilization কিভাবে করা যায় তাই আমাদের দেখতে হবে।

ধরা যাক একটি সমস্যাসংকুল মহকুমা হাসপাতালের প্রধান কর্মনির্বাহক ঠিক করলেন যে তিনি বিজ্ঞানসম্মতভাবে হাসপাতাল পরিচালনা করবেন। কিভাবে তিনি এগোবেন? প্রথমেই তাকে লক্ষ্য / উদ্দেশ্য / উপায় / পদ্ধতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ঠিক করে নিতে হবে। ধরা যাক তিনি এইভাবে ঠিক করলেন—

লক্ষ্য ।। মানবজাতির সেবা ও কল্যাণ।

উদ্দেশ্য ।। যতদূর সম্ভব বেশীসংখ্যক রোগীর সেবা।

উপায় ।। হাসপাতাল অর্থাৎ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, লোকজন,

ওষুধপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির সাহায্যেই এই উদ্দেশ্যপূর্তি করতে হবে।

মূলধন ॥ চিকিৎসক-অচিকিৎসক তাবৎ কর্মচারীর বিদ্যা, অভিজ্ঞতা এবং সৌজন্যবোধ।

পদ্ধতি ॥ তাবৎ কর্মচারীদের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতা বা মোটিভেশন নিশ্চিত করা।

এই যে ব্যাপারগুলো ঠিক করা গেল এগুলো তেমন কিছু নতুন কথা নয়। মোটামুটিভাবে এইগুলো সবাই-ই জানেন এবং বলেও থাকেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এর প্রতিটিকে অনুসরণ করা খুব সোজা কথা নয়। হাসপাতাল হচ্ছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা প্রতিমুহূর্তে সাধারণ জনগণের সংস্পর্শে আসছে। কাজেই মানুষে মানুষে পারস্পরিক সম্পর্কের ঘাত-প্রতিঘাতই হাসপাতালের জনপ্রিয়তা ও সাফল্যকে নির্ধারিত করে দেয়। ডাক্তার ও রোগীর যে সম্পর্ক তা আজ আর দাতা-গ্রহীতার সম্পর্ক নয়, তা হচ্ছে সেবক ও সেবা গ্রহণকারীর সম্পর্ক। ডাক্তার যদি তার রোগীকে বিজ্ঞানীর impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিতে দেখেন তবে ডাক্তার হিসেবে তিনি অন্যায় করেন না বা রোগীর প্রতি তার কর্তব্যতে কোনও ত্রুটী হয় না। কিন্তু রোগী যেহেতু মানুষ, এঞ্জিনীয়র যেমন যন্ত্রকে দেখেন সেই impersonal বা নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি এখানে অচল। এখানে মানবিক দৃষ্টিভংগী একান্ত প্রয়োজনীয়। একটুখানি মমতাসূচক কথা বা আরোও একটু attention-এ যে ফল আসবে, পূর্ণরোগমুক্তিতেও হয়তো সেই ফললাভ হবে না। ফলতঃ হাসপাতালের প্রতিটি কর্মীকে পাবলিক রিলেশন্স্ ম্যানের মত ব্যবহার করতে হবে। এই অ্যাপ্রোচ্ শুধু হাসপাতালের ক্ষেত্রেই নয়, যেখানেই কোনও প্রতিষ্ঠান সাধারণ জনতার সংস্পর্শে আসছে সেখানেই একান্ত প্রয়োজনীয়।

চিকিৎসক অচিকিৎসক তাবৎ কর্মচারীর মোটিভেশন বা স্বেচ্ছা-উদ্বুদ্ধতা কিভাবে নিশ্চিত করা যায়? প্রথমেই দেখতে হবে যে প্রধান কর্মনির্বাহক নিজেই মোটিভেটেড বা স্ব-উদ্বুদ্ধ কি না? তিনি যদি নিজেই স্ব-উদ্বুদ্ধ না হন তাহলে অন্যের মোটিভেশনের কথা তিনি কি করে ভাববেন? মোটিভেশন সম্বন্ধে পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমরা যে আলোচনা করেছি সেই আলোচনার ফলগুলোকে তার কাজে লাগাতে হবে। শুধু মোটিভেশনই নয়, বিভিন্ন

ম্যানেজমেণ্ট টেক্‌নিক্‌স্‌ও কাজে লাগানোর উপায় খুঁজে বের করতে হবে অর্থাৎ এককথায় প্রধান কর্ম-নির্বাহককে পাকা ম্যানেজার হতে হবে।

এই ব্যাপারটা শুধু হাসপাতালই নয়, স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান অফিস-কাছারী সর্বত্র সমানভাবে প্রযোজ্য। যে কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মনির্বাহককে ম্যানেজমেণ্ট-বিজ্ঞান জানতে হবে এবং ম্যানেজারের কাজ করতে হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আজ আমরা যে অব্যবস্থা দেখি তার কারণই হচ্ছে ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে ম্যানেজারিয়াল অ্যাপ্রোচের অভাব। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই অব্যবস্থা কখনও দূর করা যাবে না।

এই অ্যাপ্রোচ প্রসংগে নিয়মকানুনের বাধানিষেধের কথা খুব সহজেই চলে আসে। ব্যুরোক্রাসী বা আমলাতন্ত্র নৈর্ব্যক্তিক। নিয়মকানুন, রুলস্‌-রেগুলেশনস ইত্যাদিই এখানে আসল, ব্যক্তিকে এখানে বিশ্বাস করা হয় না। তাই নিয়মকানুনগুলো এমন আটোসাঁটো ভাবে তৈরী করা হয় যেন কোন আমলাই নিজের কর্মের গণ্ডী অতিক্রম করে না যেতে পারে। এই আমলা-তন্ত্রের বাড়াবাড়ি শেষকালে এমন পর্য্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে নিয়মসিদ্ধতাই আসল হয়ে ওঠে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, কর্মী, ফলগ্রাহী ব্যক্তি—কোনও কিছুই আর প্রধান বিবেচ্য থাকে না, রুলস রেগুলেশনসই প্রধান বিবেচ্য বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। এই আমলাতান্ত্রিক বাধানিষেধের নিগড় আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে উন্নয়নের পথের প্রধান প্রতিবন্ধক ছাড়া আর কিছুই নয়। উন্নয়নের অর্থই হচ্ছে প্রগতি অর্থাৎ স্থিতাবস্থায় খুশী না থেকে নিত্য নতুন অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো। প্রাক্‌-স্বাধীনতা যুগে স্থিতাবস্থা বজায় রাখাই ছিল সমস্ত অ্যাডমিনিষ্ট্রেসনের লক্ষ্য। কাজেই নিয়মনিষ্ঠা ও Precedenceর প্রতি আনুগত্য থাক্‌লেই কাজ হত। কিন্তু আজ যেহেতু উন্নয়নই লক্ষ্য, অনেক সময়ই নিয়ম-কানুনগুলো বাধা হয়ে দাঁড়ায়, Precedent-এর জন্য পুরোনো ঘটনাবলী বা সিদ্ধান্তসমূহ আঁতি-পাঁতি করে খুঁজলেও ঠিকমত সাহায্য পাওয়া যায় না। উন্নয়নের পক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের যে অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেসন্‌ আমরা তাকেই ম্যানেজমেণ্ট বলতে পারি। নিয়মকানুন কি একেবারেই দরকার নেই? নিশ্চয়ই দরকার আছে, কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কীর্ণ মনোভাবের দরকার নেই। এই নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কীর্ণতা কিভাবে মানুষকে মানবিক

মনোবৃত্তি ভুলিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারায় ইতিহাসের পাতা খুললেই আমরা সে শিক্ষা পাই। ধর্মের সহজ সরল আধ্যাত্মিক ধারণাকে কিভাবে রীতিনীতির বেড়াজালে হারিয়ে ফেলা হয়েছিল আমাদের ধর্মকর্মের বিবর্তনের ইতিহাস আলোচনায় তা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গংগায় জীবন্ত শিশু বিসর্জন বা সতীদাহের মত অমানবিক কাজকর্ম শুধু আমাদেরই নিজস্ব নয়, পশ্চিমের উন্নত দেশগুলোও ডাইনী পোড়ানোর নাম করে কম করে নি। এই ব্যাপারগুলো কোনও দেশ বা জাতির প্রবৃত্তিজনিত কারণে ঘটে নি। এগুলো ঘটেছে মূল্যবোধের অবক্ষয়ে। নিয়মতান্ত্রিক সঙ্কীর্ণ মনোভাবই মূল্যবোধের অবক্ষয়ের প্রধান কারণ।

একদা মধ্যযুগে যে নিয়মতান্ত্রিকতা মানুষকে নিষ্ঠুর করে তুলেছিল, যে নিয়মতান্ত্রিকতার বশে মানুষ আপন শিশুকে হত্যা করতে পারতো, আজকের যুগে সেই নিয়মতান্ত্রিকতাই যে মানুষের জাগতিক সমৃদ্ধির উন্নয়নে বাধার সৃষ্টি করছে না, সেই গ্যারাণ্টি কোথায়? বস্তুতঃ প্রগতির শিশুকে আমরা নিয়মকানুনের বাধানিষেধের বেড়াজালে গলাটিপে ধরেছি এবং তার নাভিশ্বাস উঠ্‌ছে।

আমরা দেশের সমস্ত লোক তো দূরের কথা, যে সামান্যসংখ্যক লোক প্রতি বছর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণ্ডী অতিক্রম করে বেরিয়ে আসে, তাদের প্রত্যেককে চাকুরী দিতে পারছি না। কাজেই আমরা বেঁচে যাই যদি এরা ব্যবসায় বা শিল্পে স্ব-নিযুক্ত হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটির-শিল্প স্থাপন, ছোট দোকানদারী, মিনিবাস-ট্যাক্সি ইত্যাদি চালানো—এইসব ব্যাপারগুলোতে আমরা শিক্ষিত বেকারদের লাগাতে চাইছি। কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের পদ্ধতি তথা নিয়মকানুনের বহর কি তা কি আমরা প্র্যাকটিক্যাল দৃষ্টিতে খতিয়ে দেখি? শুনেছি একবার নাকি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে কোনও একটি বিষয়ে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র সময়ের তুলনায় ভীষণ Lengthy হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। স্যার আশুতোষ তখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কর্ণধার। তিনি কিছু না করে যে অধ্যাপক প্রশ্নপত্র রচনা করে-ছিলেন তাঁকেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিয়েছিলেন। তখন সেই অধ্যাপক বুঝলেন যে Lengthy প্রশ্নপত্র করলে কেন তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করা যায় না। নতুন ব্যবসায় বা শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা

এবং তাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যাওয়া এমনিতেই দুরূহ ব্যাপার। উদ্যোগ-পরায়ণতা বা Entrepreneurship না থাকলে তা সম্ভব নয়। কিন্তু যে নিয়ম-কানুন ও পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে নতুন কোনও উদ্যোগীকে বর্তমানে যেতে হয় তা কোনও প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বা পুরোনো শিল্পোদ্যোগী ভাবতেও পারবেন না। বিভিন্নপ্রকার লাইসেন্স, পারমিট আর রেজিষ্ট্রেশনের বেড়াজাল ছিন্ন করে তবুও যে কিছু নতুন প্রতিষ্ঠান গজিয়ে উঠছে তা দেখেই অবাক হতে হয়। যারা নিয়মকানুনের বাধানিষেধ তৈরি করেন তাদের কাউকে যদি একটি নতুন প্রতিষ্ঠান চালু করে দেখাতে হয় তাহলেই তিনি বুঝবেন কত ধানে কত চাল হয়।

কোনও ব্যবসায় বা শিল্প স্থাপনের মত উদ্যোগ একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায় কখনও চায় না যে নতুন কোন ব্যবসায় গড়ে উঠুক। যে সমস্ত সরকারী/বেসরকারী বিভাগ ব্যবসায়ের সঙ্গে ওতোপ্রতো-ভাবে জড়িত তাদের কাজকর্মের গতি-প্রকৃতিও বৃহদায়তন ব্যবসায়ের পক্ষে অনুকূল। পোষ্ট অফিস, মিউনিসিপ্যালিটি বা কর্পোরেশন, আয়কর বিক্রয়কর অফিস, পেটেন্ট রেজিষ্ট্রেশন অফিস থেকে শুরু করে ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন গোছের প্রতিষ্ঠান পর্যন্ত সবাই একসূত্রে বাঁধা। এইসব জায়গায় অতিরিক্ত কিছু না ছাড়লে কোনও কাজ হয় না। নতুন উদ্যোগীর পক্ষে এই অতিরিক্তের দাবী মেটানো অত্যন্ত মুস্কিলকর ব্যাপার। কিছু প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এই সব বিভাগের লোকজনের স্বভাব এমন খারাপ করে দিয়েছেন যে আগে যে অতিরিক্ত কিছু ছিল বখশিসের নামান্তর আজ তা হয়ে গেছে দস্তুর বা দাবী বিশেষ। যে বাঘ মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে গেছে তাকে কি আর তা থেকে ফেরানো যায়! পুরোনো ব্যবসায়ীরা জানেন তাকে কোথায় কত অতিরিক্ত ছাড়তে হবে বা কোথায় কিভাবে কাজ হবে। ফলতঃ তিনি নিজেও উল্টোপাল্টাভাবে সেই আয়ের ব্যবস্থা করেন এবং সবাইকে দিয়ে নিজেও বেশ কিছু কালো টাকা বানিয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

নতুন যারা ব্যবসায়ে নামবে তারা সমাজের এই ব্যবহারিক চিত্র জানে না। 'সততাই একমাত্র মূলধন' গোছের ধারণায় এরা অভ্যস্ত। সমস্ত সদিচ্ছা নিয়ে এরা যখন কাজে নামে এঁদের মাথা থেকে পুরোনো ধ্যানধারণাগুলো লুপ্ত হয়ে যায় না। ফলতঃ সমাজের সঙ্গে প্রথম সংস্পর্শের ফল এদের কাছে বিষময়

হয়ে ওঠে। 'অতিরিক্ত কিছু'র যোগান যোগাড় করার সমস্যাটা প্রথম কিছু শুরু করার আনুষঙ্গিক খরচপত্রের হিসেবের মধ্যেই ধরা যেতে পারে। কিন্তু আসল সমস্যাটা অর্থের নয়—তা হচ্ছে মনোবৃত্তির। সাইকোলজিক্যালি নতুন উদ্যোগীরা প্রথম যে ধাক্কা পায় সেটা তাদের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক। বেশীর ভাগই এই ধাক্কার জের সামলাতে পারে না, ফলতঃ কাজকর্মে তামাদি পড়ে।

আমরা আগেই বলেছি 'উদ্যোগ' একটি প্রতিযোগিতামূলক ব্যাপার। কিছু উদ্যোগী যে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে না পেরে শেষ হয়ে যাবে সেটা তো অত্যন্ত সত্য কথা। কিন্তু আমাদের এখানে ভাবতে হবে যে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা কি? আমরা চাই দ্রুত উন্নয়ন, আমরা চাই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার, আমরা চাই যে শিক্ষিত যুবকদের বেশীর ভাগই স্ব-নিযুক্ত হয়ে যাক। এই যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহলে এই উদ্দেশ্যপূর্তির অনুকূল প্ল্যান-প্রোগ্রাম কি আমাদের আছে? যে সমস্ত সরকারী বা বেসরকারী বিভাগ ও সংস্থা ব্যবসায় প্রসারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তারা কি কোনও সহযোগী মনোবৃত্তি নিয়ে এগিয়ে আসছে? আমাদের সামাজিক আবহ ও চেতনা কি উদ্যোগ প্রসারের পক্ষে অনুকূল? এই প্রশ্নগুলো আজ আমাদের তলিয়ে ভাবতে হবে এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাদি নিতে হবে।

আমাদের মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিল্প বা ব্যবসায়মূলক প্রতিষ্ঠান-গুলোকে নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করা যায়:

সরকারী বিভাগীয় সংস্থা
সরকারী কর্পোরেশনস্
সরকারী কোম্পানী
যৌথ (সরকারী+বেসরকারী) উদ্যোগের কোম্পানী
পাবলিক কোম্পানী (বেসরকারী)
প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী
ব্যক্তিগত ফার্ম

এর থেকে একটা জিনিষ বেশ পরিষ্কার হয়ে ওঠে। তা হচ্ছে এই যে আমাদের অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও সরকারী উদ্যোগ উভয়ই সমগুরুত্বপূর্ণ। সরকার বা রাষ্ট্রের ভূমিকা আরোও বেশী গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সরকার শুধু কয়েকটি

প্রতিষ্ঠানই পরিচালনা করে না—সামগ্রিক ভাবে দেশের অর্থনীতি ও মুদ্রা
ব্যবস্থার নিয়ামকও বটে। কাজেই সরকারের নির্ধারিত নীতির মধ্যেই
সরকারী বেসরকারী যাবতীয় প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হয়।

শুধুমাত্র নীতি নির্ধারণই নয় সরকারী সংস্থাগুলোর আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের
ধারা প্রধারা ও সাফল্য অসাফল্যও দেশের অর্থনীতিতে ও শিল্প ব্যবসায়ে
বিরাট প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোই আজ
প্রত্যেক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রিত করছে। জল, বিদ্যুৎ যোগাযোগ,
যানবাহন—রেল, প্লেন, বাস ইত্যাদি, রেশনব্যবস্থা, জ্বালানী—কয়লা,
পেট্রোলিয়ম, কাঠ, স্বাস্থ্য, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সব ব্যাপারেই সরকারই
প্রধান। সরকার বা রাষ্ট্র শুধু মালিকই বটে কিন্তু কাজকর্ম পরিচালনা কিছু
অভিজ্ঞ ও যোগ্য লোকেরই হাতে ন্যস্ত রয়েছে। এরা যদি ঠিকমত কাজকর্ম
পরিচালনা করেন তাহলে সংস্থাগুলো যে শুধু লাভেরই মুখ দেখে তাই নয়,
জনসাধারণের কষ্ট লাঘব হয়, অসন্তোষ কমে ও সরকারী বিধিব্যবস্থায় মানুষের
আস্থা আরও দৃঢ় হয়। এই যে বৃহৎ সরকারী সংস্থাগুলো আমাদের দৈনন্দিন
জীবন নিয়ন্ত্রিত করে এগুলোর সাধারণ কর্মচারীবৃন্দও অত্যন্ত সংগঠিত। যে
আবশ্যিক সংস্থায় শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দ অত্যন্ত সংগঠিত সেখানে শ্রমিক কর্ম-
চারীর মাইনে পত্রও যে অত্যন্ত বেশি এবং ক্রমবর্ধমান হবে সেকথা প্রায় চোখ
বুজে বলে দেওয়া যায়। অত্যন্ত বেশী আয় বলতে আমরা ক্ষুদ্র শিল্প বা ব্যক্তি
গত ও ছোট ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান তথা কৃষক, মুটে, মজুর ইত্যাদি ক্ষেত্রের
অসংগঠিত শ্রমিক-কর্মচারীবৃন্দের আয়ের তুলনায় এদের আয় যে অনেক বেশী
সে কথাই বলছি। কোন সংস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত হয়ে গেলেই যে সংস্থাভুক্ত সকল
কর্মচারী দেশভক্ত ও মোটিভেটেড বা স্ব-উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে তার কোন নিশ্চয়তা
নেই। তবে কর্মচারীবৃন্দ যে অত্যন্ত সংগঠিত ও প্রবল হয়ে উঠবে সে বিষয়ে
কোন সন্দেহ নেই। ফলতঃ দেশের সমগ্র শ্রমিক বা কর্মচারীবৃন্দের মধ্যে
আয় ও অন্যান্য সুবিধার বিচারে এদের স্থান যে সবার উপরে হবে সে বিষয়ে
কোন সন্দেহের কারণ নেই। কিন্তু কাজকর্মের এফিসীয়েন্সী কি বাড়ছে?
এই সংস্থাগুলোর আভ্যন্তরীণ ম্যানেজমেণ্ট কি উন্নততর হচ্ছে? রাষ্ট্রায়ত্ত
প্রতিষ্ঠানগুলোতে কি কোনও সুনির্দিষ্ট ম্যানেজমেণ্ট পদ্ধতি গড়ে উঠেছে?
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানগুলো বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের তুলনায় কি better

managed ? এই প্রশ্নগুলো নীতি-নির্ধারকদের ভেবে চিন্তে দেখতে হবে।

আজ সরকার, সরকারী বিভাগ, সরকারী সংস্থা ইত্যাদি অকর্মণ্যতা, লোকসানের বোঝা, আমলাতন্ত্র, আমলাতন্ত্রের সব রকম দোষ, হাস্যকর কিছু নিয়মকানুন ইত্যাদি ধারণার সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। অর্থাৎ প্রথম কথাগুলো মনে এলেই দ্বিতীয় প্রকারের ধারণাগুলো আমাদের মাথায় চলে আসে, কেন ? একি শুধু বিরুদ্ধ প্রচারের ফল ? হয়তো কিছুটা। কিন্তু সরকারী কাজকর্মের ভুক্তভোগী আমরা সকলেই। টেলিফোনের বিল বা ইলেক্‌ট্রিসিটির বিল সবাইকে দিতে হয়, রেল বা বাস সকলেই চাপে। প্রায় সবাইকেই রেশনকার্ড তৈরী করতে হয়। বৃহৎ সরকারী একচেটিয়া সংস্থাগুলোর আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ও কাজকর্মের সঙ্গে আমরা প্রায় সকলেই পরিচিত। আমাদের পরিচয় ফলাফলের সঙ্গে—কারণের সঙ্গে নয়। আমরা জানি না একচেটিয়া সংস্থাগুলোর দোষ কি, আমরা জানি না আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা কিভাবে গড়ে ওঠে, আমরা জানি না বৃহদায়তন সংগঠন আর ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের তফাৎ কি, প্রয়োজনীয়তা কি—আমরা জানি না বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত সংগঠিত শ্রমিক কর্মচারীবৃন্দ কি করতে পারে কি না করতে পারে, আমরা দেখি না শিল্পব্যবস্থায় বহুদলীয় ইউনিয়ন ব্যবস্থার সুফল-কুফল কি, আমরা বুঝি না যে কোন বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে কিছু প্রকৃত অকর্মণ্য বা অনুপযুক্ত কর্মচারীর বোঝা টেনে যেতে হয়। কিন্তু আমরা বুঝি ফলাফল—এবং ফলাফলই সার্থকতা বিচারের একমাত্র মাপকাঠি।

রাষ্ট্রায়ত্ত বা সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে আজ আমাদের একটা সুনির্দিষ্ট ম্যানেজমেণ্ট প্যাটার্ণ খুঁজে বের করতে হবে। এ ব্যাপারে নীতি নির্ধারকদের দায়িত্ব অনেকখানি। রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে কতটা স্বায়ত্বশাসন দেওয়া যায় এই ব্যাপারটা নীতি নির্ধারকদের সর্বপ্রথমে ঠিক করে নিতে হবে। সংস্থাগুলোর প্রধান ম্যানেজার বা কর্ম-নির্বাহক কে বা কারা হবেন সে বিষয়েও আমাদের আরেকটু তলিয়ে দেখতে হবে। উন্নয়ন একটা চ্যালেঞ্জ—পুরোনো ব্যবস্থাকে পরিবর্তিত করে নূতন ব্যবস্থা তৈরী করা। ম্যানেজার যদি তার এই দায়িত্ব না বোঝেন তাহলে কি করে চলবে ? অবসরপ্রাপ্ত, প্রায় বৃদ্ধ কিছু লোক কোন সংস্থার প্রধান হবেন, না dynamic কিছু অপেক্ষাকৃত কমবয়সী লোককে সংস্থার প্রধান করা হবে—তা ভেবে দেখার যথেষ্ট দরকার

আছে। যে ব্যক্তির একমাত্র মোটিভেশন হচ্ছে কোনও মতে কিছুদিন কাটিয়ে দেওয়া তাকে দিয়ে কি কোনও প্রকৃত চ্যালেঞ্জমূলক কাজ পাওয়া যেতে পারে? সরকারী সংস্থাগুলোর ব্যাপারে আজ আমাদের অনেক সার্বিক ভাবনা-চিন্তার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। মনে রাখা দরকার যে আমরা যে পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে হাত লাগিয়েছি সে পদ্ধতিতে আগে কোন দেশ উন্নয়ন করে নি। আমাদের এই প্রচেষ্টার দিকে তৃতীয় বিশ্ব তাকিয়ে রয়েছে। আমরা যদি এই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হই তাহলে অনেক আশা-ভরসার জলাঞ্জলি ঘটবে।

বেসরকারী ক্ষেত্রে আমাদের যে শিল্প বা ব্যবসায়-উদ্যোগ তা ব্যক্তিগত ফার্মই হোক আর যৌথ মূলধনী কোম্পানীই হোক তা মূলতঃ একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ণ অনুসরণ করেই পরিচালিত হয়। বেসরকারী ক্ষেত্রে কয়েকটি পরিবার মাত্র দেশের যাবতীয় সম্পদ নিজেদের অধিকারে রেখেছে। ফলতঃ বেশীরভাগ প্রতিষ্ঠানই কয়েকটি পরিবার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। স্বাধীনতা লাভের অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে ম্যানেজিং এজেন্সি সিষ্টেম নামে একটি ব্যবস্থা চালু ছিল। বর্তমানে অবশ্য এই ব্যবস্থা আইন করে তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবার ভিত্তিক ম্যানেজমেণ্ট প্রথার শুরু এই ব্যবস্থা থেকেই হয়েছিল। যদিও ম্যানেজিং এজেন্সি সিষ্টেম উঠে গেছে তবুও industrial feudalism বা শৈল্পিক সামন্ততন্ত্র এখনও রয়ে গেছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কর্তাব্যক্তিই হচ্ছেন প্রধান প্রভু। অধীনস্থ তাবৎ কর্মচারীরা তো তুচ্ছ, এমন কি স্ত্রী-পুত্র কন্যা পর্যন্ত সকলেই কর্তার দাসানুদাস—এই যে গুরু-শিষ্য বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক একেই সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বলা যেতে পারে। কৃষিব্যবস্থায় এই সামন্ততন্ত্রের প্রভাব সবচেয়ে বেশী দেখা যায়। শিল্পে বা ব্যবসায়ে এই জাতীয় সম্পর্ক একেবারেই অচল। কেননা কৃষি ও শিল্প এক নয় এবং উভয়ের উৎপাদন পদ্ধতিও ভিন্ন ধরণের। শিল্পে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানসম্মত পন্থা-পদ্ধতি যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে শিল্প জগৎ থেকে সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের যে ব্যবস্থা তাকে অতিশীঘ্র বিদায় জানাতে হবে। আমাদের দেশে বর্তমানে বেশ কয়েকটি ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান পঠন পাঠনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রতি বছরই বেশ কিছু বিশেষজ্ঞ তৈরী হচ্ছে এবং তারা বিভিন্ন সংস্থায় কর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় এদের সংখ্যা এখনো অনেক কম। আস্তে আস্তে এ

ধরনের সংস্থা আরোও বাড়াতে হবে এবং আরোও বহু বিশেষজ্ঞ আমাদের তৈরী করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে যা প্রয়োজনীয় তা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই আমূল পাল্টাতে হবে। কয়েকজন মুষ্টিমেয় ম্যানেজমেণ্ট বিশেষজ্ঞকে কাজে লাগালেই আমাদের শিল্প ব্যবসায়ে এবং অন্যান্য সামাজিক সংস্থায় ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের ব্যবহার স্বতঃসিদ্ধ হয়ে উঠবে না। আমাদের মনোপ্রাণ দিয়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীকে গ্রহণ করতে হবে এবং যে কোনও কাজকর্মে যে কোনও স্তরে ম্যানেজারিয়াল এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করতে হবে। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আরোও সম্প্রসারিত এবং সর্বব্যাপী করতে হবে। কয়েকটি Prestige institution-এর মাধ্যমে কয়েকটি ছেলেকে অত্যন্ত উচ্চস্তরের শিক্ষা দিলে আমাদের মত এতবড় দেশের তেমন কিছু একটা সাংঘাতিক উপকার হবে না। ম্যানেজমেণ্ট শিক্ষাকে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের মত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গীভূত করা ছাড়া বৃহত্তর জন-মানসে ম্যানেজমেণ্ট দৃষ্টিভঙ্গী সম্বন্ধে কোনও পরিবর্তন আনা যাবে না। যত তাড়াতাড়ি আমাদের সমাজনায়করা, রাজনৈতিক নেতারা এবং নীতিনির্ধারকরা ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হবেন তত তাড়াতাড়ি সাধারণ শিক্ষাক্ষেত্রে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের আত্ম-প্রকাশ ঘটবে। অতএব ম্যানেজমেণ্টের স্বপক্ষে সুদৃঢ় জনমত গঠন করা ছাড়া 'ম্যানেজমেণ্ট আন্দোলনের' বিকাশের আর কোনও পথ নেই। এ ব্যাপারে ম্যানেজমেণ্ট বিশারদরা যতটা কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন, অন্য কেউ তা পারবেন না। সেজন্য আমাদের যে কয়জন মুষ্টিমেয় ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানী রয়েছেন তাঁদেরই আজ এগিয়ে আসতে হবে। বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায়, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানের ধ্যানধারণা ছড়িয়ে দিতে হবে। ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞানীরা তাঁদের ধ্যানধারণা বা আলাপ আলোচনা যদি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ রাখেন তাহলে আপামর জনসাধারণ তাঁদের জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে একটা সশ্রদ্ধ ভীতির ভাব হয়তো পোষণ করবে কিন্তু এই অনুন্নত দেশের উন্নয়ন মোটেই ত্বরান্বিত হবে না। যত তাড়াতাড়ি আমাদের এই উপলব্ধি আসে যে ম্যানেজমেণ্ট বিজ্ঞান ছাড়া গতি নেই, অন্য কোন পথ নেই —নান্য পন্থাঃ বিদ্যতে অয়নায়—ততই মংগল।

———

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	আছে	হবে
২০	১৭	যৌত্তিকতা	যৌক্তিকতা
২৮	২০	management	movement
৪১/৬২	১০/১৭	continum	continuum
৫২	২	শেখায়	বাধ্য করায়
৬৬	শেষ লাইন	টাল্‌বে	টাবে
৮৬	৬	কর্ম ক্লান্তিকর	কম ক্লান্তিকর
৮৬	২৬	কর্ম	ফর্ম
১১৭	২	কথা	সম্পর্কের কথা
১১৯	২৪	একদল	একজন